সত্যের সন্ধানে

সত্যের সন্ধানে

وَلَا تَلْبِسُوا۟ ٱلْحَقَّ
بِٱلْبَٰطِلِ وَتَكْتُمُوا۟ ٱلْحَقَّ
وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

''তোমরা সত্যের সঙ্গে মিথ্যার মিশ্রণ করিও না,
আর জেনে শুনে সত্যকে গোপন করিও না''

সুরা বাকারা ৪২

ইসলাম সম্বন্ধে বিস্তারিত নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ তথ্য
অবগত হতে হলে :-
http://al-islam.org/faq/

শিরোনাম : সত্যের সন্ধানে
প্রকাশক : আব্বাস মুলজানি সাহেব
প্রকাশকাল :২০শে জামাদিউস সানী ১৪৩৯ হিঃ
কম্পোজ : স্পিনিক্স মিডিয়া এ্যাসোসিয়েট
মুদ্রণ :১৪ মাসুমীন প্রিন্টার্স, উলুবেড়িয়া
প্রচ্ছদ : মুস্তাক আহমদ, 9051375515
মূল্য : ৬০টাকা মাত্র

Title : Satyer Sandhane
Published By : Abbas Muljani Saheb
Date of Publishing : 20th Jamadish-Sani 1439Hijri
Composed By : Sphynix Media Associate
Print By : 14 Masumin Printers, Uluberia
Cover Design : Mustak Ahamed / 9051375515
Price : 60/- Rupees Only

ভূমিকা :

কোন এমন যুগ অতিবাহিত হয়নি যে, ‘স্বার্থদ্বারা সত্যকে’ আঘাত করা হয়নি! বরং সকল যুগে স্বার্থের অক্টোপাসে সত্যকে পর্যায়ক্রমে আঘাত করা হয়েছে। কিন্তু ‘সত্য’ এমন এক বিষয় যা সবসময় ‘স্বার্থকে’ পরাজিত করেছে। কারণ সত্যের মধ্যে একটি অমোঘ শক্তি নিহিত। আর স্বার্থ হল সমুদ্রের উপরে ফেনার মত- যা আসে আর যায়, বরং অপমানের সহিত মিলিয়ে যায়।

আল্লাহ্‌পাক ‘সত্য’কে সম্মান দিয়েছেন। আর ‘স্বার্থ’কে অপমানিত করেছেন। তাই স্বার্থবাদীরা আজও ইতিহাসের ডাস্টবিনে অপমানের সহিত নিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে। আর সত্য ঝিনুকের মাঝে মুক্তার মত বা কয়লার অতলে হীরার মত জ্বলজ্বল হয়ে চিরভাস্বর হয়ে আছে।

‘সত্য’ সবসময় নিরবে-নির্মলে আর নির্জনে থাকতে পচ্ছন্দ করে। তাই সে আজও অমূল্য সম্পদ। কিন্তু সত্যের বৈশিষ্ট্য হল- ‘সত্যে’র কোন নিজস্ব স্বার্থ নেই। তাই সত্যকে সবসময় সন্ধান করতে হয়, যারা নিঃস্বার্থের পথে সত্যের তালাশে থাকে তারাই সত্যের সন্মুখীন হবার সৌভাগ্য লাভ করে।

এই বই এমনই ‘সত্যের সন্ধান’ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। লেখক অনেক গবেষণার প্রচেষ্টা চালিয়ে সত্যকে আমাদের সন্মুখে উপস্থিত করেছেন সূত্রের সহিত। বিশ্বের কোন গ্রন্থের, কত পৃষ্ঠায় বা কত অধ্যায়ে লেখা আছে তা থেকে সংগ্রহ করেছেন তিনি।

স্বার্থের হৈ-হট্টোগোলে অ-মানবিকতার রঙ্গ-মঞ্চকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে লেখক প্রমাণ ভিত্তিকি ‘সত্যকে’ উপস্থাপন করেছেন। তাই পান্ডিত্যের হুক্কা হুয়াতে স্বার্থের জাল যারা বুনছে-তারা হতাশার সাগরে হাবুডুবু খাবেন,- একথা পরিস্কার হয়ে গেছে। বরং প্রমাণিত হয়ে গেছে ‘পন্ডিতগণ’ স্বার্থবাজ।

প্রসঙ্গকথা :

মুম্বাইয়ে থাকেন জনাব আব্বাস মুলজানি সাহেব। গত ২০১৬ সালে যে বৎসর আমি হজ্বে যায়, সেই বছর হজ্বে যাওয়ার দু'মাস পূর্বে কলকাতার ''হাজি কারবালায়''- নামক এক ইমামবাড়াতে আলাপ হয় জনাব মূলজানি সাহেবের সাথে। উনি আমাকে দেখা মাত্রই চিনে ফেললেন, কারণ আমি (মুম্বই থেকে সম্প্রচারিত) Channel Win-এ বাংলা ইসলামিক অনুষ্ঠান করেছিলাম। তাই উনি আমাকে দেখা মাত্রই বললেন, তুমি Win-এ কাজ করেছো কি ? আমি বললাম, আমিই সর্বপ্রথম ২০১৬ এ ২৪শে জানুয়ারী Channel Win-এ বাংলা অনুষ্ঠান করেছিলাম, যা সম্প্রচার হয় উক্ত বৎসরের ১৬ই মে থেকে ১২দিন।

তা যায় হোক, পরিচয় পর্ব শেষ করার পর, আমাকে মুলজানি সাহেব জানালেন বাংলা ভাষায় আহলে বাইতের প্রচার করার লক্ষ্যে তুমি কি কি কাজ আর করেছো? আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া 'সত্যের পথে', শিশু-কিশোরদের জন্য 'ভোরের ফুল'নামক দুটি বাংলা পত্রিকা উনাকে দেখালাম। বললাম: আমি শিয়া হওয়ার পর থেকেই প্রিয় আহলে বাইতের প্রচারের জন্য দীর্ঘ পাঁচ বৎসর এই পত্রিকাগুলি প্রকাশ করে চলেছি বাংলার বুকে বাংলা ভাষায়।- তা দেখে-শুনে উনি খুশি হলেন। কারণ উনি কলকাতায় এসেছিলেন আহলে বাইতের প্রচারের কাজ করতে। আসলে মুলজানি সাহেব ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার উপরেই অলরেডি কাজ করে চলেছেন। যা আমার কাছেও খুশির বিষয়। কারন আমার মনে সত্যকে প্রকাশ করার তাড়না কাজ করছে।

সেই সত্যের প্রকাশের লক্ষ্যে মুলজানি সাহেব এই বইটি প্রকাশ করতে আমাকে দায়িত্ব দিলেন। বললেন, যত তাড়াতাড়ি হয় বইটি প্রকাশ করো। কিন্তু মুশকিল হয় ঐ সময়, 'সময় ও পরিস্থিতি' আমার অনুকূলে ছিল না। আমার কাছে যে ছেলেটি বাংলা D.T.P করে, সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে, প্রায় তিন'মাস সে কাজে আসতে পারেনি। ফলে বইটি প্রকাশে দেরী হয়ে গেল।

তবে আল্লাহ্‌র রহমতে বইটি প্রকাশ হল, নাম দেওয়া হল 'সত্যের সন্ধানে'। পাঠকগণ পড়ে খুবই উপকৃত হবেন। আশা করি তারা অনেক সত্যের সন্মুখীন হবেন - যা এতদিন চাপা ছিল। বরং চাপা রাখা হয়েছিল। পড়ে উপকৃত হলে অবশ্যই আমাদের জন্য দোয়া করতে ভুল করবেন না। পরে আবারও এরকম অভিনব বই নিয়ে হাজির হবো ইনশাআল্লাহ্‌।

ইতি,
খোদা হাফেজ
মুস্তাক আহমদ
ধূলাসিমলা, উলুবেড়িয়া, হাওড়া
২২/০২/২০১৮

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ইসলামের বারো ইমাম প্রসঙ্গে

রসুল(সঃ)-এর এই বারো জন উত্তরসূরী কারা? ৩
সুন্নী আলেমগণ কি বলেন? ৩
ইবনে আল-আরাবী ৩
কাজী আইয়াদ-আল ইয়াহসুবী ৩
জালালুদ্দীন আল-সুউতী ৪
ইবনে হাজার আল-আসকালানী ৪
ইবনে আল জাওজী ৪
আল-নববী ৪
আল-বায়হাকী ৫
ইবনে কাসির ৫
দ্বিধানিত কেন? ৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

কেন শিয়ারা দুই নামাজকে একত্রে আদায় করেন?

সুন্নী আলেম দ্বারা ব্যাখ্যা ৭
আল-কোরআনে নামাজের সময় ৭
রসুল(সঃ) কি নামাজ একত্রে পড়ছেন ? ৮
কিন্তু সেটি কি ভ্রমণ, ভয় বা বৃষ্টির কারনে ছিল না? ৮
অনুমোদিত হলেও তা কেন করতে হবে ? ৯
পরিশেষ ১০

তৃতীয় অধ্যায়

কেন শিয়ারা তুরাবাহ্-তে সিজদাহ্ করে ?

রসুল(সঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ কি কখনো এরূপ করেছেন? ১১
তবে খুমরা কি? ১২
কিন্তু কারবালার মাটি কেন ? ১২
কারাবালার মাটিতে সিজদাহ্ করা কি বাধ্যতামূলক ? ১৩

চতুর্থ অধ্যায়

গাদীরে খুম নিয়ে আলোচনা :

রসূল (সঃ) কি একজন উত্তরসূরী মনোনীত করেছিলেন ? ১৪
কিন্তু 'মাওলা' বলতে কি বন্ধু বোঝায় না ? ১৪
গাদীর খুম-এর দিনে কি ঘটেছিল ? ১৬
সুন্নী পন্ডিতগণ কি গাদীরের ঘটনা সত্য বলে স্বীকার করেন ? ১৭
নবী (সঃ) এর সুন্নতের উৎস প্রসঙ্গ ১৮

পঞ্চম অধ্যায়

সাহাবী প্রসঙ্গ

সাহাবীদের সম্পর্কে শিয়া মতামত ১৯
সাহাবীর সংজ্ঞা ২০
সকল সাহাবী কি সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন? ২০
আল-ওয়ালিদ বিন উকবাহ ২১
প্রশ্ন ২২
উপসংহার ২২

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিয়াগণ কি ভিন্ন কোরআনে বিশ্বাসী ? ২৪
প্রশ্ন ২৫
প্রশ্ন ২৫
প্রশ্ন ২৫

সপ্তম অধ্যায়

আত্মার গুনাবলী

জ্ঞান অন্বেষন ২৬
জ্ঞানের বাস্তবতা ২৭
সত্য জ্ঞান অর্জনের কল্যাণ ২৮
সত্য জ্ঞানের নৈতিক গুণাবলী ২৮
যখন জ্ঞান অর্জন নিষেধ ২৯
জ্ঞান অর্জনের অত্যাবশকীয় শর্তাবলী ৩০
পরিশেষ ৩১

অষ্টম অধ্যায়

হযরত মুহাম্মদ প্রসঙ্গ

অমুসলিমরা মুহাম্মদ সম্পর্কে বলে ৩১
মাইকেল এইচ. হার্ট ৩১
আলফোসে ডি লামার্টিন ৩২
রেভারেন্ড বসওয়ার্থ স্মিথ ৩২
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ৩২
এডোয়ার্ড গিবন ৩২
অ্যানি বেস্যান্ত ৩৩
এডওয়ার্ড গিবন ৩৩
উইলিয়াম মনটগোমারী ওয়াট ৩৩

নবম অধ্যায়

জ্ঞানচর্চা

যে ধর্মোপদেশের কোন যতি চিহ্ন নেই ৩৪
এই ধর্মোপদেশের বিশেষ বিশেষত্ব কী? ৩৪
এমন কি আর কোনো ধর্মোপদেশ আছে ? ৩৪
হযরত আলী(আঃ) এমন কতৃত্বপূর্ণ কার্যের অধিকারী হলেন কিভাবে ? ৩৫
হযরত আলী (আঃ)-এর বিখ্যাত ভাষণগুলির মধ্যে একটি ভাষণ ৩৫

দশম অধ্যায়

শিয়া প্রসঙ্গ

শিয়া কাদের বলা হয় ? ৩৮
পরিশেষ ৩৯
আল কোরআনে শিয়া ৩৯

একাদশতম অধ্যায়

আল কোরআনে ইমাম ও তওবা

আত্মার গুণাবলী ৪১
তাওবাহ্‌র বাস্তবতা ৪১
তাওবাহ্‌র অত্যাবশ্যকীয় এবং প্রয়োজনীয় শর্তাবলী ৪১
তাওবাতুন্ নাসুহ্ (আন্তরিক অনুতাপ) ৪২
যত শীঘ্র তত মঙ্গল ৪৩
তাওবাহ্‌র জন্য হৃদয় জাগ্রত করার ডাক ৪৪
পরিশেষ ৪৫

প্রথম অধ্যায় :
ইসলামের বারো ইমাম প্রসঙ্গে :

জাবির ইবনে সামুরা বর্ণনা করেন, আমি রসুল (সঃ)-কে বলতে শুনেছি: **''বারো জন ইমাম আসবেন।''** অতঃপর তিনি আরও বলেন যা আমি শুনতে পাই নাই। আমার বাবা বলেন, নবীজী সংযুক্ত করলেন, ''তাদের প্রত্যেকেই হবে কুরাইশ বংশের।'' *[সূত্র : সাহীহ আল-বুখারী (ইংরাজী) হাদীস: ৯ : ৩২৯, কিতাবুল আহকাম; সহীহ আল-বুখারী (আরবী), ৪ :১৬৫, কিতাবুল আহকাম]*

রসূল (স:) বলেছেন, ''ধর্ম (ইসলাম) ঐ সময় (কিয়ামতের দিন) পর্যন্ত স্থায়ী হবে এবং তোমাদের বারোজন খলিফা হবে, যাদের সকলেই হবে কুরাইশ বংশের থেকে।'' *[সূত্র : সহীহ মুসলিম (ইংরাজী), পরিচ্ছেদ ---------, খন্ড-৩, পৃ: ১০১০, হাদীস: ৪৪৮৩; সহীহ মুসলিম (আরবী), কিতাব আল-ইমারা, ১৯৮০ সৌদি আরবের সংস্করন, খন্ড-৩, পৃ: ১৪৫৩, হাদীস- ১০]*

রসুল (সঃ)-এর এই বারোজন উত্তরসূরী কারা ?
সুন্নী আলেমগণ কি বলেন ঃ

ইবনে আল-আরাবী ঃ রসূল (সঃ)-এর পর আমরা বারোজন আমীর গণনা করেছি। তারা হলেন: আবুবকর, উমর, উসমান, আলী, হাসান, মুয়াবিয়াহ, ইয়াজিদ, মুয়াবিয়াহ ইবনে ইয়াজিদ, মারওয়ান, আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান, ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালিক, মারওয়ান, আসসাফফাহ...এর পর বনি আব্বাসের ২৭জন খলিফা ছিলেন।

এখন যদি আমরা তাদের বারোজনকে বিবেচনা করি আমরা সুলাইমান পর্যন্ত পৌছাতে পারি। যদি আমরা আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করি তাহলে আমরা পাই ৫জন এবং তাদের প্রধান চার ন্যায়বান খলিফার সাথে উমর বিন আব্দুল আজিজকেও যোগ করি... এই হাদীসের অর্থ আমার বোধগম্য নয়।

[সূত্র : ইবনে আল-আরবী : সরহে সুনান তিরমিজী ৯:৬৮-৬৯]

কাজী আইয়াদ-আল ইয়াহসুবী : খলিফার সংখ্যা তার চেয়ে বেশী। তাদের সংখ্যা বারোজনে সীমাবদ্ধ করা ঠিক নয়। রসুল (সঃ) বলেননি যে তাদের সংখ্যা হবে কেবল বারো এবং তাদের সংখ্যা বেশি হবার সুযোগ নেই। সুতরাং এ সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে।

[সূত্র : আল-নববী, শরহে সহীহ-মুসলিম, ১২ :২০১-২০২; ইবনে হাজার আল-আসকালানী ফতহুল বারি, ১৬:৩৩৯]

জালালুদ্দীন আল-সুউতী : কিয়ামত পর্যন্ত কেবল বারোজন খলিফা। তাঁরা সকলেই সত্যের পথে থাকবেন, যদিও তারা একের পর এক আগমন নাও করেন।

আমাদের মতে বারোজনের মধ্যে চারজন হলেন ন্যায়বান খলিফা, এরপর যথাক্রমে হাসান, মুয়াবিয়াহ, ইবনে যুবাইর, এবং সর্বশেষে উমর বিন আব্দুল-আজিজ। এরা হলেন আট জন, চারজন বাকি থাকেন। ইমাম মেহেদী যিনি আব্বাসীয় গোত্রের, একজন আব্বাসীয় হিসাবে তিনি অর্ন্তভুক্ত হতে পারেন, ঠিক তেমনি যেমন উমর বিন আবদুল আজিজ ছিলেন একজন উমাইয়াহ। তাহির আব্বাসিও এর অর্ন্তভুক্ত হবেন কারণ তিনি ছিলেন একজন ন্যায়বান শাসক। সুতরাং আরও দু'জন, যাদের আগমন এখনও ঘটেনি। তাদের একজন হবেন মেহেদী কারন তিনি রসূল(সঃ)-এর বংশধর।

[সূত্র : আলসুফতি, ফারিখ আল-খুলাফা, পৃঃ ১২; ইবনে হাজার আল-হাইতমি, আল-সাওয়ায়িক আল-মুহরিকা পৃঃ ১৯]

ইবনে হাজার আল-আসকালানী : সহীহ বুখারীর এই হাদীসটি সর্ম্পকে কারও বেশি ধারনা নেই। এটা বলা ঠিক হবে না যে, এই ইমামগন একই সাথে একই সময়ে অবস্থান করবেন।

[সূত্র : ইবনে হাজার আল-আসকালানী, ফতহুল বারী, ১৬:৩৩৮-৩৪১]

ইবনে আল জাওজী : বনি উমাইয়ার প্রথম খলিফা ছিল ইয়াজীদ ইবনে মুয়াবিয়াহ এবং সর্বশেষ মারওয়ান বিন হাকাম। তাদের মোট সংখ্যা তের জন। উসমান, মুয়াবিয়াহ এবং যুবায়েরকে এর অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি যেহেতু তারা ছিলেন রসূল (সঃ)-এর সাহাবী।

আমরা যদি মারওয়ান বিন আল-হাকামকে বাদ দিই কারন তার সাহাবী হওয়ার ব্যাপারটি বিতর্কিত, অথবা সে আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের-এর জন সমর্থন থাকা সত্ত্বেও ক্ষমতায় ছিল, তবে আমরা বারো সংখ্যাটি মেলাতে পারি।....বনি উমাইয়াদের থেকে খিলাফত হাত ছাড়া হয়ে গেলে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, যতদিন না বনি আব্বাস ক্ষমতায় আসে। অতঃপর মূল অবস্থা পরিপূর্ণভাবে বদলে যায়।

[সূত্র : ইবনে আল-জাওজী, কাশফ আল-মুসকিল, ইবনে হাজার আল-আসকালানী, ফতহুল-বারী ১৬:৩৪০-তে সিবতে ইবনে আল-জাওজী হতে ব্যাখ্যা করেন।]

আল-নববী : এতে এমনও বোঝা যেতে পারে যে, ইসলামী প্রাধান্যের সময় মোট বারো জন ইমাম থাকবে। যখন ইসলাম ক্ষমতাসীন হবে, এই খলিফাগন তাদের ক্ষমতাকালীন সময়, ধর্মকে গৌরাবান্বিত করবেন।

[সূত্র : আল-নববী : শরহে সাহিহ মুসলিম, পৃঃ ১২ : ২০২-২০৩]

আল-বায়হাকী : এই সংখ্যা (বারো) ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিক এর সময় পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছিল। তারপর ছিল অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা, এবং তার অব্যবহিত পরই এল আব্বাসীয় রাজত্ব। এ সময়ে ইমামদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যদি আমরা তাদের কিছু বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করি যা বিশৃঙ্খলার কারনে ঘটেছে, তাহলে তাদের সংখ্যা আরও অনেক বেশী হবে।

[সূত্র : ইবনে কাসির, তারিখ, ৬ : ২৪৯ ; আল-সুয়্যতি, তারিখ আল-খুলাফা পৃঃ ১১]

ইবনে কাসির : যারা বায়হাকীকে অনুসরণ করেন এবং তার দাবীর সাথে একমত পোষণ করেন যে, 'জামাআ' বলতে ঐ খলিফাদের বুঝায় যাঁরা পাপী ওয়ালিদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে আব্দুল মালিক এর সময় পর্যন্ত এসেছেন, এবং তারা হাদিসের সেই ব্যাখ্যাকারিদের আওতাভুক্ত যাদের নিয়ে সমালোচনা ও অভিযোগ রয়েছে।

যদি আমরা আব্দুল মালিকের পূর্বে জুবায়ের খিলাফত স্বীকার করে নিই তাহলে ইমামের সংখ্যা হওয়া উচিৎ ষোলো। যদিও তাদের মোট সংখ্যা উমর ইবনে আব্দুল আজিজের পূর্ব পর্যন্ত বারো হওয়া উচিৎ। এই পদ্ধতিতে উমর ইবনে আব্দুল আজিজ নয়, ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়াহ অর্ন্তভুক্ত হবে। যাই হোক প্রতিষ্ঠিত যে অধিকাংশ আলেমগণই স্বীকার করেন যে, উমর ইবনে আব্দুল আজিজ একজন সত্য পরায়ণ ও ন্যায়বান খলিফা ছিলেন। *[সূত্র : ইবনে কাসির, তারিখ-৬ : ২৪৯-২৫০]*

দ্বিধান্বিত কেন ?

প্রকৃতপক্ষ্যে এ বারো জন উত্তরসূরী, খলিফা, আমীর এবং ইমাম যে কারা তা পরিস্কার ভাবে বুঝতে আমাদের আর একজন সুন্নী আলিম দরকার :

বিখ্যাত আলিম আল-যাহাবী তার তাজকিরাত আল-হুফফাজ, খন্ড ৪ পৃঃ ২৯৮, গ্রন্থে এবং ইবনে হাজার আল-আসকালানী তার আল-দুরার আল-কামিনাহ, খন্ড ১, পৃঃ ৬৭ গ্রন্থে বলেন যে, সদদ্দিন ইব্রাহিম বিন মুহম্মদ আল-হামাওয়াই আল-জুওয়াইনি আল-শাফীই একজন সুবিখ্যাত হাদীস বিশারদ ছিলেন। উক্ত আল-জুওয়াইনী আব্দুল ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রসূল (সঃ) বলেন, ''আমি নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আলী ইবনে আবি তালিব হল উত্তরাধিকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আর আমার পর আমার উত্তরাধিকারী হবে বারো জন। যাদের মধ্যে প্রথম জন হবে আলী ইবনে আবি তালিব এবং সর্বশেষ জন হবে আল মেহেদী।'' আল-জুওয়াইনি, ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এবং তিনি মুহম্মদ (সঃ) থেকে আরও বর্ণনা করেন :

''নিশ্চয় আমার পর আমার খলিফা এবং আমার উত্তরসূরী এবং আল্লাহ্র সৃষ্টিজগতে আল্লাহ্র নিদর্শনের সংখ্যা হবে বারো। তাঁদের প্রথম জন হবে আমার ভাই এবং সর্বশেষ জন হবে আমার (দৌহিত্র) পুত্র।'' তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল : ''হে আল্লাহ্র রসূল, আপনার ভাই কে ? তিনি বললেন, ''আলী ইবনে আবি তালিব'' অতঃপর তাঁরা জানতে চাইলেন, 'এবং আপনার পুত্র কে ?'' রসূল (সঃ) উত্তর দিলেন, ''আল মেহেদী যখন পৃথিবী অত্যাচার ও কুশাসনে ভরে যাবে তখন তিনি ন্যায়বিচার ও সাম্য কায়েম করবেন। এবং তাঁর কসম, যিনি আমাকে সতর্ককারী এবং সুসংবাদ প্রদানকারী করেছেন, যদি এই মহাবিশ্ব আর একদিনও অবশিষ্ট থাকে তবে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ঐ দিনকে বিস্তৃত করবেন সে দিন পর্যন্ত যে দিন তিনি আমার পুত্র মেহেদীকে এই পৃথিবীতে পাঠাবেন, তারপর রুহুলাহ্ ঈসা ইবনে মরিয়াম (আঃ)-কে অবতীর্ন করবেন এবং তাঁর (মেহেদী) পিছনে নামাজ পড়বেন। এবং তাঁর দীপ্তিতে সমস্ত পৃথিবী আলোকিত হবে। এবং তাঁর ক্ষমতা পূর্ব হতে পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়বে। আল-জুওয়াইনি আরও বর্ণনা করেন যে রসূল (সঃ) বলেছেন, ''আমি, আলী, হাসান, হোসাইন এবং হোসাইনের নয় জন বংশধর হল পবিত্র এবং নির্ভূল।''

[সূত্র : আল-জুওয়াইনী, ফারাইদ আল-সিমতাইন, মুআসসাসাত আল-মাহমুদী লি-তাবাহ, বেইরুত ১৯৭৮, পৃঃ ১৬০]

ইসলামী চিন্তা ধারার সকল শাখার মধ্যে, শুধু ইসনা আশারিয়াহ্ ইমামিয়া শিয়াগণই (বারো ইমামে বিশ্বাসী) নবী (সঃ)-এর বারো জন ন্যায়বান উত্তরসূরীকে বারো ইমাম হিসাবে বিশ্বাস করে এবং তাঁরা তাদের নিকট থেকেই ইসলামের জ্ঞান আহরণ করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় :

''নামাজ কায়েম করুন সূর্য ঢলে যাবার পর হতে রাতের অন্ধকার নেমে আসা পর্যন্ত এবং ফজরের কোরআন পাঠ। নিশ্চয়ই ফজরের কোরআন পাঠ মুখোমুখি হয়। *(সূত্র : আল-কোরআন, সুরা বনী ঈসরাঈল, আয়াত :৭৮)*

কেন শিয়ারা দুই নামাজকে একত্রে আদায় করেন ?

শিয়ারা পাঁচ ওয়াক্ত পালনীয় নামাজকে স্বীকার করেন। কিন্তু তারা প্রায়শই যোহর ও আসরের নামাজকে পর পর যুক্ত ভাবে আদায় করেন, যোহরের জন্য নির্দিষ্ট সময় বা ওয়াক্ত শুরু হবার পর হতে আসরের জন্য নির্দিষ্ট যে শেষ সময়(ওয়াক্তের শেষ সময়)

এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সময়ে। একইভাবে তারা মাগরিব ও এসা-র নামাজ একত্রে পড়াকেও অনুমোদিত বলে মনে করেন। এ প্রচলনটি পবিত্র আল-কোরআন এবং সেই সাথে রসুল (সঃ)-এর প্রমাণিত ও বিশুদ্ধ হাদীস সমূহের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। সুন্নী ফিকাহ অবশ্য পালনীয় নামাজ এভাবে একত্রে অনুমোদন করে(আল-জামায়া'বাইন আস-সালাতাঈন) কেবল বৃষ্টি, ভ্রমণ, ভয় অথবা কোন জরুরি ক্ষেত্রে। এ মতের ব্যতিক্রম হলো হানাফি ফিকাহ। হানাফী ফিকাহ অনুযায়ী, হজ্বের সময় 'মুজদালিফায়' ছাড়া অন্য কোন সময়ে প্রতি দিনের নামাজকে একত্রে পড়া যাবে না। মালেকী, শাফেয়ী এবং হাম্বলি ফিকাহ ভ্রমণের সময় নামাজ একত্রে পড়াকে অনুমোদন করলেও অন্যান্য কারণের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে। শিয়া জাফরী ফিকাহ অনুযায়ী কোন ব্যক্তির নির্দিষ্ট কোন কারণ ছাড়াই এভাবে নামাজ একত্রে পড়া অনুমোদিত।

সুন্নী আলেম দ্বারা ব্যাখ্যা :

সুবিখ্যাত সুন্নী মুফাস্সির (ব্যাখ্যাকারী) ইমাম ফখরুদ্দীন আল-রাজী সুরা বনি ইসরাঈলের ৭৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ''যদি অন্ধকার (গা-স্বাক) এর অর্থ করা হয় - 'যখন প্রথম অন্ধকার দেখা দেয়', তাহলে গা-সাক্ব-ই হচ্ছে মাগরিব শুরু করার সময়। সে অনুযায়ী এ আয়াতে নামাজের তিনটি সময়ের কথা বলা হয়েছে:'যা মাগরিব শুরুর সময় এবং ফজরের সময়''। সে হিসাবে মধ্যাহ্নের পরের সময়টি 'যোহর' এবং 'আসর' নামাজের জন্য। আর মাগরিব শুরুর সময়টি 'মাগরিব' ও 'এশা'-র নামাজের জন্য। সুতরাং 'যোহর' ও 'আসর' এবং 'মাগরিব' ও 'এসা' সবসময় একত্রে অনুমোদিত। তবে কোন কারণ ছাড়াই স্বাভাবিক অবস্থানকালে দুই নামাজকে একত্রে পড়া যে অনুমোদিত নয় সে ব্যাপারে প্রমাণ রয়েছে। এটি কার্যতঃ এ মতকেই সমর্থন করে যে, নামাজ একত্রে পড়া অনুমোদিত, ভ্রমণকালে কিংবা বৃষ্টি হলে ইত্যাদি।''

[সূত্র : ফখরুদ্দীন আল-রাজী, তাফসির আল-কাবীর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪২৮]

আল-কোরআনে নামাজের সময় :

আমরা এখানে অখন্ডনীয় প্রমাণ দিয়ে এটি স্পষ্ট করে তুলে ধরবো যে, কোন কারণ ছাড়াই দুই নামাজকে একত্রে পড়া সম্পূর্ণ বৈধ ও সঠিক। যায়হোক, এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, অবশ্য পালনীয় পাঁচ নামাজের সময় কেবল তিনটি : ১)মধ্যাহ্নের পরের সময় যাতে দু'টি অবশ্য পালনীয় নামাজ 'যোহর'(মধ্যাহ্ন) এবং 'আসর' (অপরাহ্ন) এ দুই নামাজেরই অংশ রয়েছে ;২)মাগরিব শুরুর সময় যাতে 'মাগরিব' ও 'এশা'-এ উভয় নামাজের অংশ রয়েছে; ৩) ফজরের সময়(সকাল)।

রসূল(সঃ)কি নামাজ একত্রে পড়েছেন ?

ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) মদীনায় সাত(রাকাত) এবং আট(রাকাত) এবং মাগরিব ও এশা পড়েছেন (সাত রাকাত)।

[সূত্র : সহীহ বুখারী (ইংরেজী অনুবাদ), খন্ড-১ অধ্যায়-১০, হাদীস নং - ৫৩৭; সহীহ মুসলিম (ইংরেজী অনুবাদ), কিতাবুস সালাত, খন্ড-৪, অধ্যায়-১০০। স্বভাবিক অবস্থানকালে দুই নামাজ একত্রে পড়া, হাদীস নং-১৫২২]

আব্দুল্লাহ বিন শাকিক বর্ণনা করেন : একদিন ইবনে আব্বাস (আসরের নামাজের পর) বিকেলে আমাদের সামনে বক্তৃতা করছিলেন এবং তা দীর্ঘায়িত করেছিলেন। সূর্য ডুবে গিয়ে আকাশে তারা দেখা যাওয়া পর্যন্ত এবং এতে লোকেরা বলতে লাগল : নামাজ, নামাজ। সেখানে বনু তামিম গোত্রের এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তিনি কোন শৈথিল্যও প্রদর্শন করেননি আবার সেখান থেকে উঠেও যাননি, বরং (ক্রমাগত চিৎকার করে) বলতে লাগলেন : নামাজ, নামাজ। ইবনে আব্বাস বললেন, ''তোমার মা হতে তুমি বঞ্চিত হও, তুমি কি আমাকে সুন্নাহ শেখাতে চাও ?'' এরপর তিনি বললেন, ''আমি আল্লাহর রসূল(সঃ)-কে 'যোহর ও আসর' এবং 'মাগরিব ও এশা'-র নামাজ একত্রে পড়তে দেখেছি।'' আব্দুল্লাহ বিন শাকিক বলেন : ''এতে আমার মনে কিছুটা সন্দেহ সৃষ্টি হল। তাই আমি আবু হুরাইরা-এর নিকট এসে তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম এবং তিনি তার সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।''

[সূত্র : সহীহ মুসলিম(ইংরেজী অনুবাদ),কিতাবুস সালাত, খন্ড-৪, অধ্যায়-১০০। স্বভাবিক অবস্থানকালে দুই নামাজ একত্রে পড়া, হাদীস নং-১৫২৩-১৫২৪]

কিন্তু সেটি কি ভ্রমণ, ভয় বা বৃষ্টির কারনে ছিল না?

অনেক হাদীস থেকে এটি স্পষ্ট বোঝা যায় যে, রসূল(সঃ) কোন সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই দু'নামাজ একত্রে পড়তেন। রসূল (সঃ) মদীনায় অবস্থানকালে, যখন তিনি ভ্রমণে ছিলেন না, সাত ও আট রাকাত পড়তেন (এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি 'মাগরিব' ও 'এশার'-র সাত রাকাত, এবং 'যোহর' ও 'আসরের' আট রাকাত একত্রে পড়েছেন।

[সূত্র : আহমদ ইবনে হাম্বল আল-মুসনাদ; খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২২১]

রসূল (সঃ) কোন ভয় বা ভ্রমণের কারণ ছাড়াই 'যোহর' ও 'আসর' একত্রে পড়েছেন, এবং 'মাগরিব' ও'এশা' একত্রে পড়েছেন।

[সূত্র : মালিক ইবনে আনাস, আল-মুয়াত্তা, খন্ড-১, পৃষ্টা-১৬১]

বরং কিছু হাদীসে রসূল (সঃ) এভাবে একত্রে নামাজ আদায়ের যৌক্তিকতা কি ছিল তা'ও বর্ণনা করা হয়েছে। এটি ছিল উম্মতের সুবিধার জন্য।

ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) মদীনায় অবস্থানকালে যোহরের নামাজকে আসরের নামাজের সাথে একত্রে পড়তেন এবং মাগরিবের নামাজকে এশার নামাজের সাথে একত্রে পড়তেন, কোন ভীতিকর পরিস্থিতি বা বৃষ্টিপাতের কারণ ছাড়াই। এবং ওয়াকি-এর বর্ণনা মতে (তার বাসায়): ''আমি ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন তিনি এরূপ করতেন? তিনি জবাব দিলেন, যাতে তাঁর রসূল (সঃ)-এর উম্মত(অযথা) কোন কষ্টের মধ্যে পড়ে না যায়।''

[সূত্র : সহীহ্ মুসলিম (ইংরেজী অনুবাদ), কিতাবুস সালাত, দুই নামাজ একত্রে পড়া, হাদীস নং-১৫২০, সুনান আল-তিরমিযী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৬]

আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) মদিনায় অবস্থানকালে যোহর ও আসরের নামাজ একত্রে পড়েছেন, কোন ভীতিকর পরিস্থিতি বা ভ্রমণের কারণ ছাড়াই। আবু জুবাইর বলেন,'' আমি সাঈদ-কে(একজন হাদীস বর্ণনাকারী) জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কেন এরূপ করতেন ? তিনি বললেন, আমি ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যেভাবে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করলে। তিনি উত্তরে বলেছিলেন যে, তিনি (রসূল-সঃ) চেয়েছিলেন যাতে তাঁর উম্মতের কেউ (অযথা) কষ্টের মধ্যে না পড়ে।''

[সূত্র : সহীহ্ মুসলিম (ইংরেজী অনুবাদ), কিতাবুস, খন্ড-৪, অধ্যায়-১০০, স্বাভাবিক অবস্থান কালে দুই নামাজ একত্রে পড়া, হাদীস নং১৫১৬]]

অনুমোদিত হলেও তা কেন করতে হবে ?

কেউ একথা বলে না যে, প্রতিদিন নামাজ পৃথকভাবে পড়তে কোন ত্রুটি আছে। যোহর ও আসর-এর নামায, এবং মাগরিব ও এশা-র নামাজ একত্রে কিংবা পৃথকভাবেও পড়া যায়। তবে রসূল (সঃ) কর্তৃক এভাবে দুই নামাজকে একত্রে পড়ার মধ্যে 'উম্মতের জন্য সহজ হবার' মত মহান আল্লাহ্‌র ঐশী করুণা বিদ্যমান। এ ছাড়াও শিয়াদের মধ্যে এরূপ প্রচলনের আরও অনেক কারণ রয়েছে :-

১. মানুষের নামাজমুখী ব্যস্ততা রয়েছে। রয়েছে নানা দায়িত্ব ও উদ্বিগ্নতা, বিশেষ করে সে সব যেখানে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং কাজের পদ্ধতি মুসলমানদের প্রাত্যহিক নামাজ আদায় এর উপযোগী নয়। কিছু পেশা এমন যে এর জন্য দীর্ঘ সময় ধরে ক্রমাগত বিরামহীনভাবে কাজ করতে হয়। সুতরাং শিয়ারা সুবিধার জন্য-বিশেষতঃ দু'টো নামাজের দ্বিতীয়টি যেন বাদ না পড়ে সে দিকে লক্ষ্য রেখে আনুমোদিত সময়ের শুরু বা শেষের মধ্যে যে কোন বিরতিতে দু'টো নামাজ একত্রে আদায় করেন।

২. যেখানে মুসলমানগণ অনেক দূর থেকে দু'টির একটি নামাজ আদায়ের জন্য জমায়েত হয়, সেখানে একত্রে নামাজের অনুমোদন থাকার পর পর দু'টি নামাজ জামায়েতের সাথে আদায় করে নেয়। এভাবে অবশ্য পালনীয় নামাজ যেমন আদায় হয়ে যায় তেমনি তারা জামায়াত এর নামাজ এ শরীক হওয়ায় অধিকতর পূণ্য অর্জনের সুযোগ লাভ করে। জুমা-র নামাজের কথায় ধরা যাক। আমরা লক্ষ্য করেছি হাজার হাজার সুন্নী মুসলমান ভাই জুম্মার'-র নামাজ সঠিক সময়ে জামায়াতের সাথে আদায় করলেও তাদের অনেকেই আসরের নামাজ আদায়ই করেন না- জামায়াত তো দূরের কথা। অন্যদিকে, শিয়া মুসলমানগন জুম্মা'-র নামাজ আদায়ের পর পরই জামায়াতের সাথে আসর-এর নামাজ আদায় করে নেন।[**নবী(সঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী**]

৩. এরূপ প্রচলনের আরও একটি কারন হলো সুন্নী ভাইয়েরা রসূল (সঃ)-এর এই সুন্নাতটি সাধারনভাবে পালন করেন না, যা শিয়া ভাইয়েরা জীবন্ত করা প্রয়োজন বলে মনে করেন। আমরা আমাদের সন্তানদের, আপরাপর মুসলমানদের এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জানাতে চাই যে, 'যোহর ও আসর'-এর নামাজ এবং মাগরিব ও এশা-র নামাজ একত্রে পড়ার প্রচলনটি কেবল অনুমোদিতই নয়,-এটি রসূল(সঃ)-এর একটি (প্রতিষ্ঠিত) সুন্নাতও। তাই নবী (সঃ)-এর সুন্নাত জীবন্ত করার মধ্যেই মানব সভ্যতার মজবুতি হবার উপায় লুকিয়ে আছে। অর্থাৎ নবী(সঃ)-এর সুন্নাতকে জীবন্ত করতে হবে।

পরিশেষে :

'যোহর ও আসর'-এর নামাজ এবং 'মাগরিব ও এশা'-র নামাজ একত্রে পড়া কেবল মুসলমানদের সুবিধার জন্যই নয়, বরং এটি কোরআনের নির্দেশের সাথে মিল আছে এবং রসুলের (সঃ) সুন্নাহ্ হিসাবে অনুমোদিত। একটি সুস্পষ্ট সুন্নাহ, সাধারণভাবে সুন্নী ভাইয়েরা পালন না করার কারণে তা আমাদের জীবনে অপালনীয় বা অকার্যকর হয়ে যায় না। সহীহ্ মুসলিম এর বিখ্যাত সুন্নী ব্যাখ্যাকারী আল্-নববী লিখেছেন, ''যখন কোন প্রচলন (সুন্নাহ)সঠিক বলে নিশ্চিত করা হয়, তখন এটি নিছক এ জন্য পরিত্যাগ করা যায় না যে অধিকাংশ বা সকল লোক এটি পরিত্যাগ করেছে।''

অর্থাৎ শিয়ারা পালন করছে বলে আমরা পালন করব না, - এটা বলে নবী(সঃ)-এর সুন্নাতকে অপমান করা ঠিক নয়।

[সূত্র : আল-নব্বী, শররে সহীহ মুসলিম, (বাইরুত, ১৩৯২হি), খন্ড-৮, পৃষ্টা-৫৬]

তৃতীয় অধ্যায় :

মাটিতে সিজদা প্রসঙ্গে :

এ প্রসঙ্গে আল-কোরআন বলছে -

''অতএব আপনি আপনার রবের প্রতি প্রশংসা জ্ঞাপন করুন এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যান।''
(সূত্র : আল-কোরআন, সুরা হিজর, আয়াত :৯৮)

কেন শিয়ারা তুরবাহ্-তে সিজদাহ্ করে ?

শিয়া মুসলমানগণ 'তুরবাহ্' নামক, ছোট এক খন্ড মাটির ওপর সিজদাহ্ করা পছন্দ করে, যা সাধারণত ইরাকের কারবালা প্রান্তরের মাটি দিয়ে তৈরী করা হয়ে থাকে।

শিয়া জাফরী ফিকাহ্ অনুযায়ী(ইসলামের পাঁচটি প্রধান চিন্তাধারার একটি)-সিজদাহ্ অবশ্যই হতে হবে বিশুদ্ধ মাটি বা মাটি হতে উৎপন্ন বস্তুর ওপর, তবে শর্ত এই যে, তা কোন খাদ্য বা পরিধেয় কিছু হবে না। এর মধ্যে রয়েছে ধূলো, পাথর, বালি এবং ঘাস। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে তা কোন খনিজ দ্রব্য হবে না। কাগজের ওপর সিজদাহ্ অনুমোদিত কেননা তা মাটিতে উৎপন্ন বস্তু হতে প্রস্তুত, কিন্তু কাপড় বা কার্পেট নয়।

সুন্নী ফিকাহ্‌র সকল ফিকাহ্‌র ফকীহ্গণই মাটি বা মাটি হতে উৎপন্ন বস্তুর ওপর সিজদাহ্ করার বৈধতার ব্যাপারে একমত।

রসূল (সঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ কি কখনও এরূপ করেছেন ?

মাটিতে ইবাদত করা নিশ্চয় **রসূল** (সঃ) ও তাঁর **সাহাবীদের** রীতি ছিল।

*** আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেন:** আমি রসূল (সঃ)-কে কাদা-মাটিতে সিজদাহ্ করতে দেখেছি এবং তাঁর কপালে কাদা-মাটির চিহ্ন দেখেছি।

[সূত্র : আল-বুখারী, সহীহ (ইংরেজী অনুবাদ), খন্ড- ১, অধ্যায়- ১২, নং-৭৯৮, খন্ড-৩,]

***আনাস বিন মালিক বর্ণনা করেন :** আমরা রসূল (সঃ)-এর সাথে তীব্র উত্তাপে

নামাজ পড়তাম এবং যদি কেউ (উত্তাপের কারণে) মাটিতে সিজদাহ্ করতে না পারতো, তাহলে তার কাপড় সেখানে বিছিয়ে দিত এবং তাতে সিজদাহ্ করতো।

[সূত্র : সহীহ্-আল-বুখারী, (ইংরাজী অনুবাদ), খন্ড-২, অধ্যায়-২২, নং-২৯৯]

এ হাদীস অনুযায়ী রসূল (সঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ কেবল বিশেষ ক্ষেত্রে কাপড়ের ওপর সিজদাহ্ করতেন।

রসূল (সঃ) 'খুমরা' ব্যবহার করতেন যাতে তিনি সিজদাহ্র সময় কপাল রাখতেন।

* **মায়মুনা বর্ণনা করেন :** আল্লাহ্র রসূল (সঃ) সাধারণতঃ 'খুমরা' ব্যবহার করতেন।

[সূত্র : আল-বুখারী, সহীহ্ (ইংরেজী অনুবাদ) খন্ড-১, অধ্যায়-৮, নং-৩৭৮]

* বিখ্যাত সুন্নী গবেষক আল-শওকানীর মতে, রসূল(সঃ)-এর দশজনেরও বেশী সংখ্যক সাহাবী 'খুমরাতে' সিজদা প্রদানের ব্যাপারে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এবং তিনি হাদীসের সব সুন্নী উৎসের তালিকা প্রণয়ন করেছেন যাতে সহীহ্ মুসলিম, সহীহ্ তিরমিযী, সুনান-এ আবু দাউদ, সুনান-এ আল-নাসাঈ এবং আরও অনেকগুলো উৎসের উল্লেখ রয়েছে।

[সূত্র : আল-শাওকানী, নাইল আল-আওয়ার, খুমরা অধ্যায়, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১২৮]

তবে 'খুমরা' কি ?

* একটি পাটি বা ম্যাট্ যা সিজদাহ্ করার সময় মুখ ও হাত রাখার জন্য যথেষ্ট।

[সূত্র : আল-বুখারী, সহীহ্(ইংরাজী অনুবাদ), খন্ড-১, অধ্যায়-৮, নং-৩৭৬ (অনুবাদকের ব্যাখ্যা অংশ)]

অপর একজন বিখ্যাত সুন্নী গবেষক ইবনে আল-আসীর তার 'জামি আল-উসুল' গ্রন্থে লিখেছেন: **'খুমরা'** হল বর্তমানে শিয়ারা সিজদার সময় যে জিনিস ব্যবহার করে তা।

[সূত্র : ইবনে আল-আসীর, জামি'আল-উসুল, (কায়রো,১৯৬৯), খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৬৭]

* 'খুমরা' হল একটি ছোট পাটি বা ম্যাট্ যা খেজুরের পাতা অথবা অন্য কোন বস্তু দিয়ে তৈরী.....এবং এটি শিয়ারা সিজদার সময় যা ব্যবহার করে তার অনুরূপ।

[সূত্র : জালখিস আল-সিহাহ্, পৃষ্ঠা-৮১]

কিন্তু কারবালার মাটি কেন?

কারবালার মাটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারটি সুপরিচিত এবং এটি রসূল(সঃ) এর সময় হতেই বিশেষ মনোযোগের বিষয় ছিল; এমনকি এর পরবর্তী সময়কালেও :

* **উম্মে সালমা বলেন :** আমি হুসাইন (আঃ)কে তাঁর নানা রসূল (সঃ)-এর কোলে বসে থাকতে দেখলাম, এ সময় তাঁর হাতে এক খন্ড লাল রং-এর মাটি ছিল। রসূল

(সঃ) সেই মাটিতে চুমু দিচ্ছিলেন এবং কাঁদছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম- এটি কিসের মাটি? রসূল (সঃ) বললেন, ''জিব্রাইল আমাকে অবহিত করেছেন যে, আমার সন্তান এই হুসাইনকে, ইরাকে শহীদ করা হবে। তিনি ঐ স্থান থেকে এ মাটি আমার জন্য এনেছেন। আমি কাঁদছি এ জন্য যে, আমার হুসাইনের ওপর কি কষ্টই না আপতিত হবে। এরপর রসূল (সঃ) ঐ মাটি উম্মে সালমার নিকট দিয়ে তাঁকে বললেন, ''যখন তুমি এ মাটি রক্তে রূপান্তরিত হতে দেখবে তখন তুমি জানবে আমার হুসাইনকে শহীদ করা হয়েছে।'' উম্মে সালমা ঐ মাটি বোতলে ভরে রাখেন এবং লক্ষ্য করতে থাকেন, এবং আশুরার দিন ১০ই মহরম ৬১ হিজরীতে ঐ মাটি রক্তে রূপান্তরিত হয়। এরপর তিনি জানলেন যে, হুসাইন ইবনে আলী (আঃ) শাহাদাত বরণ করেছেন।

[সূত্র : আল-হাকিম, আল-মুসতাদারক, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৯৮]

[সূত্র : ইবনে কাসীর, আল-বিদায়হ ওয়াল-নিহায়াহ, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৩০]

[সূত্র : আল-সুয়ুতী, খাসায়িস আল-কুবরা, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৫০, জামী আল- জাওয়ামী, খন্ড-১, পৃষ্টা-২৬]

[সূত্র : ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীব আল-তাহযীব, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৪৬]

*আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ) সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ হতে ফেরার পথে কারবালা অতিক্রম করছিলেন। তিনি সেখান থেকে এক মুষ্টি মাটি নিলেন এবং ভারাক্রান্ত হয়ে বললেন : আহ্‌ ! আহ্‌ ! এ স্থানে কিছু লোককে হত্যা করা হবে - আর তারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

[সূত্র : ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীব আল-তাহযীব, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৪৮]

কারবালার মাটিতে সিজদাহ্‌ করা কি বাধ্যতামূলক ?

না, এটি বাধ্যতামূলক না! কিন্তু শিয়ারা কারবালার মাটিতে সিজদাহ্‌ করাকে অগ্রাধিকার দেয় এ জন্য যে, রসূল (সঃ) ও তাঁর বংশধরদের (আহলে বাইত) ইমামগণ একে গুরুত্ব দিয়েছেন। ইমাম হুসাইন (আঃ) এর শাহাদতের পর তাঁর পুত্র ইমাম জয়নুল আবেদীন (আঃ) কিছু মাটি সেখান থেকে তুলে নিয়ে তা পবিত্র বলে ঘোষণা করেন এবং তিনি তা ব্যাগ-এ ভরে রাখেন। ইমামগণ সাধারণত তাতে সিজদাহ্‌ করতেন এবং তা থেকে একটি তসবীহ্‌ তৈরী করেন আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার জন্যে।

(সূত্র : ইবনে শাহ্‌র আশুব, আল মানাকিব, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫১)

তারা শিয়াদের উৎসাহিতও করতেন তাতে সিজদাহ্‌ করতে, তবে তা কোন বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে নয়, বরং অধিকতর কল্যাণ লাভের জন্যে। ইমামগণ (আঃ) উৎসাহিত করতেন যে, আল্লাহর সামনে সিজদাহ করতে হবে কেবলমাত্র পরিস্কার মাটিতে এবং এটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য যদি তা হয় কারবালার মাটি।

[সূত্র : আল-তুসী, মিসবাহ্‌ আল-মুতাহাজ্জাদ, পৃষ্ঠা-৫১১]

উৎপন্ন বস্তুরে ওপর সিজদাহ্ করি। যা কুদরতি জিনিস।

এটি অত্যন্ত দুঃখজনক যে, কিছু লোক অসৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে বলে যে, শিয়ারা পাথরের উপাসনা করে বা হুসাইন (আঃ)কে উপাসনা করে। বরং সত্য হলো; যে, আমরা 'তুরবাহ্'তে সিজদাহ করি একমাত্র আল্লাহর এবাদতের উদ্দেশ্যে, তুরবাহ্র উদ্দেশ্যে নয়। একইভাবে, আমরা কখনও ইমাম হুসাইন (আঃ), ইমাম আলী (আঃ) অথবা রসূল (সঃ) এরও ইবাদত করি না। আমরা একমাত্র আল্লাহ্র এবাদত করি, এবং আল্লাহ্র নির্দেশেই আমরা পবিত্র মাটিতে সিজদাহ্ করি।শয়তানী অপপ্রচার থেকে দূরে থাকলে, তবেই মানবিকতার ঐক্য সম্ভব।

পরিশেষে :

এ কারণেই শিয়া মুসলমানগণ ছোট মাটির খন্ড সাথে রাখে যা সাধারনতঃ কারবালার মাটি দিয়ে তৈরী। এরই মাধ্যমে তারা বিশেষভাবে নির্দেশিত বস্তুর ওপর সিজদাহ্ করতে এবং রসূল (সঃ) এর সুন্নাহ্ ও অনুসরণ করতে সক্ষম হয়।

চতুর্থ অধ্যায় :

গাদীরে খুম নিয়ে আলোচনা :

''হে রসূল, পৌঁছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ন হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না: আল্লাহ্ আপনাকে মানুষের ক্ষতি হতে রক্ষা করবেন।''

(সূত্র : কোরআন : সুরা ৫, আয়াত ৬৭)

রসূল (সঃ) কি একজন উত্তরসূরী মনোনীত করেছিলেন ?

শিয়াগণ বিশ্বাস করে যে, কোরআনের আয়াতে উল্লিখিত এ ঘোষনা অনুযায়ী মহানবী (সঃ)-এর মাধ্যমে পরিপূর্ণতা পায়, যখন তিনি গাদির খুম-এর দিনে ইমাম আলী বিন আবি তালিব (আঃ)কে তাঁর উত্তরসূরী মনোনীত করেন।

কিন্তু 'মাওলা' বলতে কি বন্ধু বোঝায় না ?

যদিও সকল যুগের এবং সকল মতাবলম্বী বহুসংখ্যক সুন্নী আলেম এই ঘটনাটি এবং রসূল (সঃ)এর ঐতিহাসিক ঘোষনার নিশ্চিত করেছেন, কিন্তু মহানবী (সঃ) এর ইন্তেকাল পরবর্তী প্রকৃত ঘটনার প্রেক্ষিতে এ বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সে সকল ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, বহু সুন্নী আলেম দাবী করেন যে, রসূল (সঃ) শুধু আলী (আঃ)কে মুসলমানদের একজন বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসেবে ঘোষনা করতে চেয়েছিলেন।

এই ঘটনার বহু দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাখ্যা করা যায় এবং তাতে দেখাা যায় যে, এই ঘটনা আরও বেশি গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ। কোরআনের কিছু আয়াতের নাযিল হওয়া, বিশাল জন সমাবেশ, নবী (সঃ)-এর জীবনের অন্তিম সময়, জনগণ কর্তৃক তাদের নিজেদের ওপর রসূল (সঃ) এর কর্তৃত্বের স্বীকৃতি, ঘটনার অব্যহিত পর হযরত উমরের অভিনন্দন ইত্যাদি আরও বিষয় যা এই স্বল্প পরিসরে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, রসূল (সঃ) কর্তৃক আলী (আঃ)-কে উত্তরাধিকারী ও ক্ষমতাসীন হিসেবে মনোনীত করাকে প্রমান করে। এটা সুস্পষ্ট যে, 'মাওলা' শব্দটি মহানবী (সঃ)-এর পর চূড়ান্ত ক্ষমতাধর এর অর্থ বহন করে, যা শুধু সীমিত ক্ষমতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

মূল কথা :

এরপরেও যদি এ ঘটনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে সন্দেহ থাকে এবং কতিপয় ব্যক্তির এ সত্যটিকে ভিন্ন রূপদানের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে, তাহলে মূল কথাকে এভাবে বলা যায়। যখন ইমাম আলী (আঃ) তাঁর খিলাফতের সময় এবং গাদীর এর ঘটনার এক দশক পর, মহানবী (সঃ) এর সঙ্গী আনাস বিন মালিককে জিজ্ঞাসা করলেন, ''কেন আপনি অগ্রসর হচ্ছেন না সাক্ষ্য দিতে যা আপনি আল্লাহর রসূল (সঃ)-কে বলতে শুনেছেন গাদির এর দিনে ?'' তিনি বললেন, ''হে আমীর আল-মুমেনীন, আমি বৃদ্ধ হয়েছি এবং আমার কিছু মনে নেই।'' তখন আলী (আঃ) বললেন, ''যদি আপনি স্বেচ্ছায় সত্যগোপন করে থাকেন, তবে যেন আল্লাহ্ আপনাকে এমন একটি সাদা দাগ (লেপ্রসি) দ্বারা চিহ্নিত করেন যা আপনার পাগড়ীতেও ঢাকা পড়ে না।' আর আনাস তার স্থান থেকে উঠার আগেই তার মুখে একটি বড় সাদা দাগ হয়ে গেল।

** সূত্র : ইবনে কুতাইবাহ আল-দিনাওয়ারি, কিতাব আল-মারিফ, (কায়রো, ১৩৫৩হি), পৃঃ ২৫১।*
**আহমাদ বিন হামবনল, আল-মাসনাদ, খন্ড১, পৃঃ ১১৯।*
**আবু নু আইম আল-ইস্পাহানী, হিলিয়াত আল-আউলিয়া,(বাইরুত,১৯৮৮), খন্ড৩, পৃঃ ২৭।*
**নুর আল-দ্বীন আল-হালাবী আল-শাফিই, আল-সিরাহ্ আল -হালাবিইয়া, খন্ড ৩, পৃঃ ৩৩৬।*
**আল-মুত্তাকি আল-হিন্দী, কানজ আল-উম্মাল,(হালাব,১৯৬৯-৮৪), খন্ড ১৩, পৃঃ ১৩১।*

গাদীর খুম-এর দিনে কি ঘটেছিল ?

গাদীর খুম জায়গাটি মক্কা থেকে কয়েক মাইল দূরে মদীনা যাওয়ার পথে অবস্থিত। যখন রসুল (সঃ) ১৮ই জিলহজ্জ (১০ই মার্চ ৬৩২খ্রী), বিদায় হজ্ব শেষে ফেরার পথে এই জায়গাটি অতিক্রম করছিলেন, তখন কোরআনের এই আয়াত, ''হে রসূল পৌঁছে দিন যা আপনার কাছে প্রেরিত হয়েছে'' নাযিল হয়। যার কারণে তিনি সেখানেই থেমে পড়লেন, এবং মক্কা হতে তাঁর সাথে আগত হজ্জযাত্রীদের ও যারা সেখান থেকে নিজ নিজ গন্তব্যে ফিরছিলেন, সকলকে উদ্দেশ্য করে একটি বিশেষ মঞ্চ তৈরী করা হল। যোহর নামাজ শেষে রসূল (সঃ) মঞ্চে বসলেন, এবং তাঁর জীবনের শেষ বক্তব্য জনসমাবেশে দিলেন, যার তিন মাস পরে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন।

রসূল (সঃ)-এর এই খুতবার সবচাইতে স্মরণীয় অংশ সেসময় যখন তিনি আলী (আঃ) এর হাত ধরে উম্মতদের উদ্দেশ্যে জানতে চাইলেন, তিনি কি ঈমানদারদের মধ্যে উন্নততর কর্তৃপক্ষ নন? জনতা সমস্বরে চীৎকার করে বলল : ''হ্যাঁ তাই, হে আল্লাহ্‌র দূত।'' অতঃপর তিনি ঘোষণা করলেন, ''আমি যার মাওলা(নেতা), আলী-ও তার মাওলা(নেতা)। হে আল্লাহ, যারা তাঁর বন্ধু তুমিও তাদের বন্ধু হও, যারা তারা শত্রু, তুমি তাদের শত্রু হও।'' রসূল (সঃ) তাঁর বক্তব্য শেষ করার পরই কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় :

''আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম, আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের একমাত্র ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম।''

(সূত্র : কোরআন ৫:৩)

এরপর রসূল (সঃ)সকলের উদ্দেশ্যে আলী (আঃ)-এর প্রতি আনুগত্যের শপথ নেয়ার এবং তাকে অভিনন্দন জানানোর নির্দেশ দিলেন। যারা শপথ নিলেন তাদের মধ্যে উমর বিন আল-খাততাবও ছিলেন, যিনি বললেন,'শাবাশ ইবনে আবু তালিব ! আজ থেকে আপনি বিশ্বাসী নারী-পুরুষদের প্রধান হলেন।''

গাদীর খুম-এর ঘটনা শুনার পর একজন আরব রসূল (সঃ)-এর নিকট এলেন এবং বললেন, ''আপনি আমাদেরকে সাক্ষ্য দিতে বললেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আপনি আল্লাহ্‌র রসূল। আমরা আপনাকে মেনে চলেছি। আপনি নির্দেশ দিয়েছেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে আমরা তা মেনে নিয়েছি। আমাদের রমজান মাসে রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন আমরা তা পালন করেছি। আপনি নির্দেশ দিয়েছেন মক্কায় হজ্জ করতে আমরা তা অনুসরণ করেছি। কিন্তু আপনি এতেও সন্তুষ্ট হননি এবং

আপনি আপনার চাচাত ভাই এর হাত নিজ হাতে তুলে ধরে নেতা হিসবে আমাদের উপর দিলেন এই বলে যে,,'আমি যার মাওলা (নেতা), আলী-ও তার মাওলা(নেতা)।' এই মনোনয়ন কি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে না আপনার পক্ষ থেকে ? রসূল (সঃ) বললেন, আল্লাহ্র নামে যিনি একমাত্র প্রভু ! এটা আল্লাহ্র পক্ষ হতে যিনি সর্বশক্তিমান এবং মহিমান্বিত।'' এ কথা শুনার পর লোকটি উঠে গেল এবং তার উটনিটির দিকে অগ্রসর হল এই বলতে বলতে, ''হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ যা বলল তা যদি সত্য হয় তবে আকাশ থেকে আমাদের উপর একটি পাথর নিক্ষেপ কর এবং আমাদেরকে ধ্বংস ও নির্যাতনের মধ্যে নিক্ষেপ কর। লোকটি তার উটনি পর্যন্ত পৌছতেও পারেনি আকাশ থেকে একটি পাথর নিক্ষেপ হল যা তার মাথায় আঘাত করে শরীরে ঢুকে গেল এবং সে, মৃত্যু মুখে পতিত হল। এই উপলক্ষে মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন।'' **''একজন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করছে অবধারিত শাস্তি সম্পর্কে, অবিশ্বাসীদের জন্য এর প্রতিরোধকারী কেউ নেই, আল্লাহ্র নিকট থেকে যিনি উন্নয়নের সোপানের অধিকর্তা।''** *(সূত্র : কোরআন ৭০:১-৩)*

সুন্নী পন্ডিতগণ কি গাদীরের ঘটনা সত্য বলে স্বীকার করেন ?

সুন্নী বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে, এ ঘটনার বিস্তারিত বা সংক্ষিপ্ত বর্ণনার সংখ্যা এত অধিক যে, তা খুবই বিস্ময়কর! এই ঐতিহাসিক কোরানিক ঘটনাটি রসূল (সঃ)-এর ১১০জন সাহাবী, ৮৪ জন তাবেঈ এবং পরবর্তীকালে ইসলাম জগতের বহুশত পন্ডিত কর্তৃক প্রথম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ (সপ্তম থেকে বিংশ শতাব্দী) হিজরির মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

এই পরিসংখ্যান শুধু সুন্নী আলেমদের দ্বারা সংরক্ষিত বর্ননার সংখ্যা মাত্র !

এই উৎস সমূহের মাত্র সামান্য কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হল। এই আলেমদের অনেকেরই কেবল রসূল(সঃ) এর ঘোষণাই বর্ননা করেননি বরং এই ঘোষণা সত্য, খাটি বলে ও মন্তব্য করেছেন।

[সূত্র : আল-হাকিম আল-ন্যয়সাবুরী, আল-মুস্তাদরাক আলা আল-সহীআইন (বাইরুত), খন্ড ৩, পৃঃ ১০৯-১১০, পৃঃ-১৩৩, পৃঃ-১৪৮, পৃঃ ৫৩৩। তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করেন যে, ইহা আল-বুখারী ও মুসলিম শরীফের মূলনীতি অনুযায়ী সহীহ্; আল-দাহাবী তার এই সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে নিশ্চিত করেছেন।আল-তিরমিযী, সুনান (কায়রো, ১৯৫২), খন্ড ৫, পৃঃ ৬৩৩। ইবনে মাজাহ, সুনান (কায়রো,১৯৫২) খন্ড ১, পৃঃ ৪৫। ইবনে হাযরা আল-আসকালানী, ফাতহ আল-বারি বি শারহ্ সহীহ্ আল-বুখারী (বাইরুত,১৯৮৮), খন্ড ৭, পৃঃ ৬১।ইবনে আল-আসির, জামি আল-উসুল,২৭৭, নং ৬৫। আল-সুয়ুতি, আল-দার

আল-মানসুর, খন্ড ২, পৃঃ ২৫৯ এবং পৃঃ ২৯৮। ফখর আল-দিন আল-রাজি, তাফসীর আল-কাবির, (বাইরুত, ১৯৮১), খন্ড ১১, পৃঃ ৫৩।ইবনে কাসির, তাফসীর কোরআন আল-আজীম (বাইরুত), খন্ড-৩, পৃঃ-১৪। আল-ওয়াহিদী, আসবাব আল-নুজুল, পৃঃ ১৬৪।ইবনে আল-আসির, উসদ আল-গাবা ফি মারিফাত আল-সাহাবা, (কায়রো), খন্ড-৩, পৃঃ-৯২।ইবনে হাযার আল-আসকালীন, তাহজীব আল-তাহজীব, (হায়দারাবাদ,১৩২৫), খন্ড ২, পৃঃ ৩০৮-৯।নুর আল-দীন আল-হালাবী আল-শাফীঈ, আল-সিরাহ আল-হালাবীইয়া, খন্ড ৩, পৃঃ-৩৩৭।আল-জুরকানী, শারহ আল-মাওয়াহীব আল-লাদুননিইয়াহ, খন্ড-৭, পৃঃ-১৩।সুন্নি আইন বিশেষজ্ঞগন সাহাবী আলোয়ালিদের এই উদাহরন তুলে ধরে এই পাপীর পেছনে নামাজ পড়াকে বৈধতা দিয়েছেন!!আলী আল-কারী আল হারাযী আল-হানাফী, শাবহে ফির হ আল আকবার, এই অধ্যায়ে 'ভাল না ফাসিক লোকের পেছনে নামাজ পড়া বৈধ', পৃষ্ঠা-৯০)]

নবী (সঃ) এর সুন্নতের উৎস প্রসঙ্গ :

আমরা কিছু ব্যক্তিদের যে দোষ ত্রুটি তুলে ধরছি- এটা পেছন থেকে আক্রমণের কোন বিকৃত চিন্তা থেকে নয়। বরং মুসলমানদেরকে সতর্ক করার জন্যে যে, কোন উৎস থেকে তারা ইসলামী মতবাদ ও নবীর সুন্নাত পাচ্ছে ? আর এই সতর্কতা এভাবে অর্জিত হতে পারে যে নবী(সঃ) এর সাহাবীদের জীবনের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে এবং তাদের চারিত্রিক বিশ্বাসযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিনীত হবে তাদের কাজ দ্বারা। তারপরও নবী(সঃ) ইতোমধ্যেই আমাদের সতর্ক করেছেন। সাহাবীদের প্রসঙ্গে নবী (সঃ) সতর্ক করে বলেছিলেন, - ''আমি ঝর্ণার নিকট তোমাদের সামনে দাঁড়াবো, এবং যে আমার পাশ দিয়ে যাবে তাকে পান করাবো এবং যে এই নহর থেকে পান করবে সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। আর এমন লোক আমার কাছে আনবে যারা আমাকে চিনবে আমিও তাদেরকে চিনব। কিন্তু তারা আমার থেকে দূরে থাকবে। তখন আমি বলব, তারা আমার সাহাবী এবং উত্তর আসবে আপনি জানেন না তারা আপনার পর কি করেছে। তারপর আমি বলব যারা আমার পর পরিবর্তিত হয়েছে তারা দূর হও।''

[সূত্র : সহীহ আল বুখারী(ইংরেজী অনুবাদ) খন্ড-৮, অধ্যায় ৭৬ সংখ্যা ৫৮৫]

তাহলে এখানে নবী(সঃ) প্রমাণ করেছেন সকল সাহাবী দ্বীন রক্ষার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নই। প্রমাণিত হল দ্বীন রক্ষার ক্ষেত্রে সাহাবীর উপরে কোন দায়-দায়িত্ব নবী(সঃ) দিয়ে যাননি, বরং সকল দায় ও পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর আহলে বাইতের উপরে ছেড়ে গিয়েছেন। দ্বীন রক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর(সঃ) আহলে বাইতই যথেষ্ট।

পঞ্চম অধ্যায় :

সাহাবীদের সম্পর্কে শিয়া মতামত :

শিয়ারা নবী (সঃ) এর ঐ সমগ্র বিশ্বাসযোগ্য সাহাবীদের ভালবাসে যাঁদের প্রশংসা কোরআনে করা হয়েছে। এই প্রশংসা অবশ্যই আল ওয়ালিদ বিন উকবাহর জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। যদিও সুন্নী মুসলমানদের মতে তিনিও একজন সাহাবী এবং এমন সাহাবীগণ সুন্নাহ অনুসরনের জন্য মডেল হতে পারে না। তাই শিয়াগণ সকল সাহাবীর সত্যতা ও ন্যায়পরায়ণতায় বিশ্বাস করেন না। বরং প্রত্যেক সাহাবীর ইতিহাস অনুসন্ধান করে রসূলের বানীর সাথে তার সংশ্লিষ্টতা ও রসূলের হুকুমের প্রতি তার অবিচল নিষ্টা যাচাই করে দেখেন। অবশ্য এমন বহু সাহাবী ছিলেন যাদের মধ্যে আছেন আম্মার, মিকদাদ, আবুদার, সালমান, জাবির এবং ইবনে আব্বাস(রাঃ)। অবশ্য এদের সংখ্যা এ কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

ইসলামের চতুর্থ ইমাম জয়নুল আবেদীন (আঃ)-এর বিনীত প্রার্থনায় অংশ বিশেষ তুলে ধরে শেষ করব, যেখানে তিনি ঐ মহৎ সাহাবী যাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট তাঁদের প্রশংসা করে প্রার্থনা করেছেন-

''হে আল্লাহ, মুহাম্মদ(সঃ)-এর সাহাবী বিশেষতঃ যাঁরা সাহাবী হিসেবে সদাচরণ করছেন, যখন তিনি তার বাণী শুনিয়েছেন তাতে যথাযথ সাড়া দিয়েছেন, তাঁর বানীর সত্যতা প্রমাণ করার জন্য বন্ধু থেকে, সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন, তাঁর নবুওয়াতী দাওয়াতকে মজবুত করার জন্য তাঁরা পিতা মাতা ও পুত্রদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। এবং যারা তাঁর বিজয়ে সাহায্য করেছেন, যাঁরা তাঁর জন্য স্নেহ মায়া মমতা পোষণ করেছেন। যাঁরা তাঁকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবেসেছেন, যাঁরা আল্লাহ্র রসূলের জাতকে দৃঢ় করে রাখার কারণে তাঁদের আত্নীয় স্বজনরা তাঁদেরকে ত্যাগ করেছে। আর যাঁরা তাঁর সাথে আত্নীয়তা করায় অন্যান্য আত্নীয়েরা তাদের ত্যাগ করেছে, তারপরও তাঁরা তাঁকে ভুলেনি। হে আল্লাহ্ যাঁরা তোমার জন্য, শুধু তোমার জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছেন, হে আল্লাহ্ তুমি তাঁদেরকে তোমার উত্তম নিয়ামত দ্বারা সন্তুষ্ট কর, তাঁরা তোমার নবীর সাথে থেকে তোমার নবীর পাশে থেকে যত প্রাণীকে তোমার দিকে ফিরিয়েছে তাদের জন্য হলেও সকলের প্রতি তোমার উত্তম নিয়ামত বর্ষণ কর।''

[সূত্র : ইমান জয়নাল আবেদীন, সহিফা আল কামিলাহ, (ইংলিশ অনুবাদ লন্ডন, ১৯৮৮ পৃঃ ২৭]

সাহাবীর সংজ্ঞা :

বিখ্যাত সুন্নি পন্ডিত ইবনে হাজার আল-আসকালানী সাহাবীদের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, সাহাবী এমন একজন যিনি নবী (সঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন, ইসলাম গ্রহনের পর এবং মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের উপর দৃঢ় ছিলেন। তিনি তাঁর নিম্নলিখিত বিষয়াদি সামিল করেছেন।

সকল ব্যক্তি যাঁরাই নবী(সঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এই বিষয় নির্বিশেষে যে, তাঁরা দীর্ঘ সময় বা স্বল্প সময় এর জন্য সাক্ষাৎ করেছিলেন।
কে কে নবী (সঃ) নিকট থেকে কৃষ্টি, সংস্কৃতি বহন করেছেন কে কে করেননি।
কে কে নবী (সঃ) এর নিকট থেকে যুদ্ধ করেছেন কে কে করেননি।
কে কে শুধু নবী (সঃ)কে দেখেছেন কিন্তু তার সাথে মজলিসে বসেননি।

[সূত্র : ইবনে হাজার আল-আসকালানী, আল-ইসাবাহ ফি তামিজা আল-সাহাবা, (বাইরুত), প্রথম খন্ড, পৃঃ- ১০]

সকল সাহাবী কি সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন ?

আহলুস সুন্নত ওয়াল জামাতের সবাই একমত এই বিষয়ে যে, প্রত্যেক সাহাবীই ন্যায়বান ও সত্যবাদী, এবং উম্মতদের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। অনেক সুন্নী মুসলমান এরকম বিশ্বাস করতেন।

[সূত্র : ইবনে হাজার আল- আসকালানী, আল ইসাবাহ ফি তামিজ আল সাহাবা, (মিশর), খন্ড- ১, পৃঃ ১৭-২২।]

[সূত্র : ইবনে আবি হাতিম আল - রাজী, আল - জার ওয়া আল - তাদিল, (হায়দারাবাদ), খন্ড- ১, পৃঃ ৭-৯।

[সূত্র : ইবনে আল- আছির, উজত আল- যাবা ফি মারিফাত আল সাহাবা, খন্ড- ১, পৃঃ-২-৩।]

বিপক্ষে সর্বসম্মত প্রমাণ থাকার কারণে এই মতামত গ্রহণ করা কষ্টকর। নিম্নলিখিত উদাহরণ বিবেচনা করুন; ''আজ-জুবাইর আমাকে বলেছেন যে, তিনি একজন আনসারী ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করেছিলেন একটা ঝর্ণা নিয়ে যা উভয়ই সেচ করতেন এবং যিনি বদর যুদ্ধে আল্লাহর বার্তা বাহকের সামনে যুদ্ধ করেছেন। আল্লাহর বার্তাবাহক আজ - জুবাইরকে বলেন, ''হে জুবাইর ! তোমার বাগানে প্রথমে সেচ কাজ কর, তারপর জলধারা তোমার প্রতিবেশীর নিকট যেতে দাও।'' আনসারী ক্রুদ্ধ হলেন এবং বললেন, ''হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক ! এ কারণে যে তিনি আপনার জ্ঞাতি ভাই?'' তখন আল্লাহ্‌র নবীর চেহারা মোবারক পরিবর্তন হয়ে গেল (রাগে) এবং বললেন (জুবাইরকে) তোমার বাগানে জল দাও এবং তারপর ইহা দেওয়াল অবধি গেলে ধরে রাখ (চারপাশে উচুঁ আল দিয়ে)। সুতরাং আল্লাহ্‌র নবী যুবাইরকে তার পূর্ণ অধিকার দান করলেন। কিন্তু তার আগে জুবাইর ও আনসারি উভয়ের পারস্পারিক উপকার হয় এমন উদার বিচার করেছিলেন। কিন্তু আনসারী যখন আল্লাহ্‌র নবীকে বিরক্ত করলেন তখন সুস্পষ্ট বিধানের আলোকে জুবাইরকে পূর্ণ অধিকার দিলেন। জুবাইর বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমার মনে হয় উক্ত বিষয়ে নিম্নলিখিত আয়াত নাযিল হয়েছে- ''অতএব তোমার পালন কর্তার শপথ, সে লোক ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক বলে মনে না করে।'' (৪ : ৬৫)''

[সূত্র : সহীহ আল বুখারী, (ইংরাজী অনুবাদ), খন্ড-৩, অধ্যায়-৪৯, সংখ্যা-৮৭১]

সুন্নী মতবাদ অনুসারে নবী (সঃ) এর এই সাহাবীকে ও নিন্দা করা যাবে না এবং তাঁকে ও সুন্নার বর্ণনাকারী বা অনুসরনকারী মানতে হবে। এবং তার কাজকর্ম আদর্শ হিসাবে আমাদেরও অনুসরণ করতে হবে। আসল সত্য এই যে, এই সাহাবী শুধু নবী (সঃ) এর বিচারকে গ্রহন করতেই অস্বীকার করেননি বরং তাঁকে দুঃখও দিয়েছেন যেজন্য আল্লাহ্ কোরআনের আয়াত নাযিল করেছেন।

দূর্ভাগ্য যে, ইসলামের ইতিহাসে এমন বহুলোকেদের উদাহরণ আছে যারা সুন্নী মতবাদ অনুসারে সাহাবী কিন্তু তাঁদের আচরণ ছিল অ-ইসলামিক। তাঁরা এই আচরন দেখিয়েছেন রসূল (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর এমনকি জীবদ্দশায় এমনকি উভয় সময়কালেই! নিচে কিছু সাহাবীর উদাহরণ দেওয়া হল, -

আল-ওয়ালিদ বিন উক্‌বাহ : পবিত্র কোরআন বলছে, -

''ফাসিক ও ঈমানদার এক হতে পারে ? তারা সমান নয়''

(*সূত্র :* কোরআন : সূরা আল সাজাদাহ, আয়াত ১৮)

নেতৃস্থানীয় সুন্নী আলেমগণ বলেন যে, এই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ হচ্ছে একটা

বিশেষ ঘটনা যেখানে এই শব্দ ''বিশ্বাসী'' বলতে ইমাম আলী বিন আবু তালিব(আঃ) এবং ফাসেক বলতে নবী (সঃ)-এর একজন তথাকথিত সাহাবী আল ওয়ালিদ বিন উকবাহ্ বিন আবু মুয়িতকে বোঝানো হয়েছে।

[সূত্র : আল-কুরতুবী, তাফসীর, (মিশর, ১৯৪৭), খন্ড- ১৪, পৃঃ- ১০৫]

[সূত্র : আল-তাবারী , তাফসির জামি, আলবায়ান, এই আয়াতের টীকা প্রসঙ্গে]

[সূত্র : আল-ওয়াহিদি, আসবাব আল-নুজুল, (দার আল-দিয়ান লি-তুরাথ সংস্করণ), পৃঃ-২৯১]

আমরা ইতিমধ্যে কোরআনের আয়াতে দেখেছি যে, ফাসিক যদি কিছু বলে তা নির্বিচারে বিশ্বাস করতে নিষেধ করেছে : ''হে বিশ্বাসীগণ ! যদি কোন ফাসিক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে, সত্য বলে নিশ্চয়তা দেয়, তোমরা তা পরিক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞতা বশত : অন্যের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকার্যের জন্য অনুতপ্ত না হও।'' *[সূত্র : সুরা আল হুজরাত আয়াত ৬]*

খুবই মজার ব্যাপার যে, এই আয়াতের ব্যাখ্যা অন্য একটি ঘটনার ইঙ্গিত দেয়, যেখানে ঠিক এই ওয়ালিদ একটি বিষয় সম্পর্কে অসত্য কথা বলেছিলেন, যে ঘটনার প্রেক্ষিতে এই আয়াতে তাকে 'ফাসিক' আখ্যায়িত করা হয় ও এই আয়াত নাযিল হয়।

[সূত্র : ইবনে কাছির, তাফসীর কোরআন আল আজিম,(বাইরুত, ১৯৮৭) খন্ড-৪, পৃঃ-২৪৪]

[সূত্র : আল-কুরতুরী, তাফসির(মিশর, ১৯৪৭) খন্ড- ১৬, পৃঃ-৩১১]

[সূত্র : আল-সুউতি এবং আল মাহালী, তাফসীর আল জালালাইন, (মিশর, ১৯৪২) খন্ড- ১, পৃঃ- ১৮৫]

[সূত্র : আবু আমিনা বিলাল ফিলিপস, তাফসীর সুরা আল হুজরাত, (রিয়াদ)পৃঃ ৬২-৬৩]

আমিনা বিলাল ফিলিপস বলেন, ''সন্দেহজনক চরিত্রের লোকজন যখন কোন তথ্য নিয়ে আসে তখন তাদের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে যাদের সত্যতা এখনও প্রমাণিত হয়নি বা যারা পাপী হিসাবে পরিচিত।'' আমরা সুন্নি হাদীসে দেখতে পায় আল ওয়ালিদের বর্ণনায় বহু হাদীস রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন; আবু দাউদ, সুনান, (১৯৭৩), কিতাব আল তারাজ্জুল বাব ফিল খুলুক লির রিজাল, খন্ড৪ পৃঃ - ৪০৪ হাদীস নম্বর ৪১৮১। আহমদ বিন হাম্বল, আল মসনদ, আউয়াল মসনদ মাদানিয়্যান আজমাইন, হাদীস ১৫৭৮৪]

আল ওয়ালিদের ধূর্ততা মহানবী (সঃ) এর সময়ই শেষ হয়নি। তিনি উসমান কর্তৃক কুফার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। সেখানেও তার ফাসেকী চলছিল। একবার তিনি ফজরের নামাজ মদ্যপান অবস্থায় পড়িয়েছিলেন এবং দু'রাকাতের পরিবর্তে চার রাকাত পড়িয়েছিলেন। ফলে উসমানের নির্দেশে তাঁকে শাস্তি পেতে হয়। এই ঘটনা বহু উৎস

থেকে বর্ণিত হয়েছে, নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল-

[সূত্র : সহীহ্ আল বুখারী (ইংরাজী ভার্সন), খন্ড-৫, অধ্যায়৫৭, সংখ্যা-৪৫; খন্ড-৫, অধ্যায়-৫৮, সংখ্যা-২১২; আল তাবারী, তা'রিখ (ইংরাজী অনুবাদ ; আলতবেরীর ইতিহাস, প্রথম যুগের খিলফতের সংকট), খন্ড-১৫, পৃঃ১২০]

প্রঃ কিন্তু সে সকল হাদিসের কি হবে, যাতে এমন কিছু আয়াতের উল্লেখ আছে যা এখন আর কোরআনের অংশ নয়?

শিয়াগণ কোন লেখক, বর্ণনাকারী বা ব্যাখ্যাকারীকেই শতভাগ নির্ভুল মনে করেন না, তাই তারা কোন হাদীস গ্রন্থকেই সম্পূর্ণ বৈধ বা শুদ্ধ মনে করেন না। তারা মনে করেন, যে গ্রন্থটি ভুলভ্রান্তির উর্দ্ধে তা হচ্ছে কোরআন। এ সকল হাদীসের অধিকাংশই দুর্বল বা অনুদিত বলে বিবেচিত কোরআনের আয়াত নয়।

* এটা লক্ষনীয় যে, বহু সংখ্যক হাদীস সহীহ্ আল-বুখারী এবং সহীহ্ মুসলিম বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো যুক্তি দেখায় যে, অনেক আয়াত বর্তমানে কোরআনে অনুপস্থিত।

[সূত্র : আল-বুখারী, আল-সহীহ্, খন্ড-৮, পৃষ্ঠ ২০৮: মুসলিম, আল -সহীহ্, খন্ড-৩, পৃঃ-১৩১৭]

* শুধু তাই নয়, এ সকল সুন্নী বর্ণনা আরো অভিযোগ করে যে, কোরআনের দুটি সুরা কোরআনে অনুপস্থিত, তাদের একটি হল সুরা আলবারা'হ (সুরা-৯) দৈর্ঘ্যের অনুরূপ!!!

[সূত্র : মুসলিম, আল-সহীহ্, কিতাব আল-জাকাত, খন্ড-২, পৃঃ ৭২৬]

* কিছু সুন্নী হাদিস আরও দাবী করে যে সুরা আল আহযাব (সুরা ৩৩) সুরা বাকারা (সুরা -২) এর মতো দীর্ঘ ছিল!!! সুরা বাকারা কোরআনের সর্ববৃহৎ সুরা। সহীহ্ আল-বুখারী ও মুসলিম এর হাদীস গুলো কিছু অনুপস্থিত আয়াত এর বিস্তারিত বণরনা করেছে। *[সূত্র : আল-বুখারি, আল-সহীহ্, খন্ড-৮, পৃঃ-২০৮]*

তবুও, ভাগ্যক্রমে শিয়ারা কখনও সুন্নী ভাই-বোনদের কোরআন অসম্পূর্ণ বিশ্বাসের ব্যাপারে অভিযোগ করে না। আমরা বলি, হয় এ সুন্নী বর্ননাগুলো দুর্বল বা বানানো।

উপসংহার :

''এটা আমাদের বিশ্বাস যে, কোরআন আল্লাহ্ তাঁর নবী (সঃ) এর উপর নাযিল করেছেন তা এই দুই আবরণ(মলাঠ) এর মধ্যে যা আছে (তার মতই) সেটাই। এবং সেটাই এটা যা বর্তমানে মানুষের হাতে হাতে আছে, এবং তার চেয়ে বেশি কিছু নয়.. এবং যে দাবি করে যে আমরা বলি যে, ইহা (বর্তমান পাঠ) এর চেয়ে আয়তনে বড় সে একজন মিথ্যাবাদী।''

[সূত্র : আস-সাদুক, কিতাবুল-ইতিক্বাদাত,(তেহরান ১৩৭০ হি.) পৃঃ ৬৩, ইংরেজী অনুবাদ, দ্য শিয়াইত ক্রিড, অনুবাদ, এ.এ.এ. ফাইজী (কলকাতা ১৯৪২) পৃঃ ৮৫]

ষষ্ঠ অধ্যায় :

''নিশ্চয়ই আমরা অনুস্মারক(কোরআন) নাযিল করেছি এবং নিশ্চয় আমরা তার সংরক্ষণকারী।''

(সূত্র : কোরআন : সুরা ১৫, আয়াত ৯)

শিয়াগন কি ভিন্ন কোরআনে বিশ্বাসী ?

শিয়াদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, তারা কোরআনের তাহরীফে বিশ্বাসী অর্থাৎ বিশ্বাস করা কোরআনকে বিকৃত করা হয়েছে এবং ঐ কোরআন নয় যা নবী (সঃ)-এর উপর নাযিল হয়।

এটা সত্য নয় !!! মিথ্যা অভিযোগ - যা কুফরী (হারাম) !

১২ ইমামে বিশ্বাসী সকল বিশিষ্ট শিয়া আলেম প্রথম থেকে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্বাস করে আসছেন যে, কোরআন পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষিত আছে। কতিপয় প্রথম যুগের প্রখ্যাত শিয়া আলেম যারা এই বিশ্বাস স্পষ্ট করে তাদের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন;

[সূত্র : ** শেইখ আল-সাদুক (মৃত্যু - ৩৮১ হি), কিতাবুল-ইতিকাদাত, (তেহরান,১৩৭০ পৃষ্ট ৬৩)*

** শেইখ আল-মুফিদ (মৃত্যু - ৪১৩ হি), আউয়ায়লুল-মাকালাত, পৃষ্ট ৫৫-৬.*

** শারিফ আল-মুরতাদা (মৃত্যু - ৪৩৬ হি), বাহ্‌রুল-ফাওয়াইদ,(তেহরান,১৩১৪)পৃষ্ট ৬৯*

** শেইখ আত-তুসী (মৃত্যু -৪৬০ হি), তাফসীর আত-তিবইয়ান,(নাযাফ,১৩৭৬) খন্ড ১, পৃষ্ট ৩*

** শেইখ আত-তাবরাসী (মৃত্যু -৫৪৮ হি) মাজমাউল-বায়ান, (লেবানন), খন্ড ১, পৃষ্ট ১৫*

পরবর্তীকালের কতিপয় আলেম যারা একই দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাদের মধ্যে রয়েছে;

**মুহাম্মদ মুহসীন আল্-ফায়েদ আল-কাশনী (মৃত্যু -১০১৯ হি), আল-ওয়াফী, খন্ড১, পৃষ্ট ২৭৩-৪, এবং আল-আসফা ফী তাফসীর আল-কোরআন, পৃষ্ট-৩৪৮।*

** মুহাম্মদ বাকির আল-মাজলিসী (মৃত্যু-১১১১হি), বিহার আল-আনওয়ার, খন্ড ৮৯,পৃষ্ট.৭৫।*

এই বিশ্বাস চলে আসছে নিরবিচ্ছিন্নভাবে তখন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত। বর্তমান শতাব্দীর শিয়া আলেম যারা এই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন যে, কোরআন সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত এবং অপরিবর্তনীয়, তাদের মধ্যে কিছু প্রখ্যাত নাম যেমন, সৈয়দ মুহসীন আল-আমিন আল-আমিলি (মৃত্যু - ১৩৭১ হি), সৈয়দ শারাফ আল-দ্বীন আল-মুসাওয়ী (মৃত্যু -১৩৭৭ হি), আল্লামাহ্ আল-তাবাতাবাই (মৃত্যু -১৪০২ হি), সৈয়দ রুহুল্লাহ্ আল-খুমায়নী(মৃত্যু - ১৪০৯ হি), সৈয়দ আবু আল-কাসিম আল-খুয়ী (মৃত্যু - ১৪১৩ হি) এবং সৈয়দ মুহাম্মদ রিদা আল-গুলপায়গানী (মৃত্যু -১৪১৪ হি)

এটি অবশ্যই একটি সম্পূর্ণ তালিকা নয় আরো আছে।

প্রশ্ন : কিন্তু এই আলেমদের পূর্বের শিয়াদের সম্পর্কে কি বলা যায়, তারা কি তাহরীফে বিশ্বাস করতেন না ?

মোটেই না! 'উবাইদুলাহ বিন মুসা আল-আবসী'র(১২০-২১৩ হি) দৃষ্টান্ত বিবেচনা করুন, একজন একনিষ্ঠ শিয়া আলেম যিনি ইমামদের কাছ থেকে পাওয়া হাদীস এর ব্যাখ্যা করেন এবং যার বর্ণনা আল-তাহ্দীব এবং আল-ইসীবসার এর মত বিখ্যাত শিয়া হাদীস গ্রন্থে পাওয়া যায়। তবে এ সম্পর্কে কতিপয় সুন্নী আলেম কি বলেন তা দেখা যাক :

* ''...একজন ধার্মিক ব্যক্তি, গুরুত্বপূর্ণ শিয়া বিশেষজ্ঞদের অন্যতম ...ইয়াহিয়া বিন মাইন তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন, আবু হাতিম বলেছেন তিনি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য... আল-ইজলী বলেছেন কোরআনের উপর তার অসাধারণ এক্তিয়ার ছিল...''

*...''তিনি ফিক্বহ, হাদীস এবং কোরআনের একজন ইমাম ছিলেন, অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ এবং ন্যায়পরায়ণ চারিত্রিক বৈশিষ্ঠ্য সম্পন্ন তিনি ছিলেন শিয়াদের অন্যতম প্রধান।''

[সূত্র : ইবনে আল-ইমাদ আল-হাম্বলী, শাদারাত আল-দাহাব(কায়রো, ১৩৫০ হি), খন্ড-২, পৃষ্ঠ-২৯]

এ সমস্ত সুন্নী আলেমদের কেউই কোরআনের উপর তার অগাধ জ্ঞানের জন্য তার প্রশংসা করতেন না যদি তারা মনে করতেন তিনি ভিন্ন কোরআনে বিশ্বাসি !!! এবং উবাইদুল্লাহ এতো বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য ছিলেন যে, শিয়া হওয়া সত্ত্বেও, বিখ্যাত সুন্নী হাদীসবীদ আল-বুখারি এবং মুসলিম এমনকি আরও অনেকে তাঁদের গ্রন্থে তার নিকট হতে বহু হাদীস সংগ্রহ করেছে!

[সূত্র : দ্য ক্রিড অফ দ্য ইমাম অফ হাদীস আল-বুখারী(সালাফী প্রকাশনী, যুক্তরাজ্য, ১৯৯৭), পৃষ্ঠ ৮৭-৮৯]

প্রশ্ন: শিয়ারা কি 'মুশাফ ফাতিমা'-তে বিশ্বাস করে না যা কোরআনের চেয়ে তিনগুন বড়?

কোরআন একটি মুশাফ (গ্রন্থ), কিন্তু সব গ্রন্থ অবশ্যই কোরআন নয় ! ফাতিমার কোন কোরআন নেই। 'মুসাফ ফাতিমা' একটি বই যা নবী(সঃ) এর ইন্তেকালের পর ফাতিমা(আঃ)দ্বারা লিখিত বা লিখায়িত। এটা কোরআনের অংশ নয় এবং আল্লাহ্‌র আদেশ বা বিধি-বিধান এর সাথে এই বই এর কোন সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন: কিন্তু শিয়াদের সংগ্রহে কি এমন কোন হাদীস নেই যা কোরআনের আয়াতের উল্লেখ করে কিছু অতিরিক্ত শব্দাবলীর সাথে যা বর্তমানে কোরআনে নেই ?

কিছু উদাহরণ আছে যেখানে অতিরিক্ত শব্দবলী সন্নিবেশিত হয়েছে ব্যাখ্যা হিসেবে, যা এটা প্রকাশ করে না যে, মূল কোরআনের আয়াত বিকৃত করা হয়েছে। শিয়া এবং সুন্নী উভয় উৎসেই এমন ঘটেছে। নিম্নের দুটি উদাহরণ বিবেচনা করা যাক, উভয়ই কোরআনের ব্যাখ্যার বিখ্যাত সুন্নী উৎস থেকে সংগৃহীত;

*''উবাই বিন কাব পড়তেন'....''অতঃপর যাদেরকে তোমরা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ভোগ করবে তাদেরকে তোমরা তাদের নির্ধারিত হক দিয়ে দাও....''(কোরআনের সুরা ৪, আয়াত২৪) এবং ইবনে আব্বাস ও অনুরূপ পড়তেন।''

[সূত্র : ফাখ্‌র আল-দিন আল-রাজী, মাফাত আল-গায়ব(বাইরুত১৯৮১), খন্ড৯, পৃঃ৫৩]

[ইবনে কাসির, তাফসীর আল-কোরআন আল-আজীম(বাইরুত ১৯৮৭), খন্ড-২, পৃঃ ২৪৪]

ইবনে কাসীর এর তাফসীর-এ এক পাদটীকায় বলা হয়েছে যে, উপরোক্ত অতিরিক্ত শব্দগুলো যা কোরআনের অংশ নয়, তা নবী (সঃ) এর সাহাবীদ্বয় তাফসীর এবং ব্যাখ্যা হিসেবে পড়তেন।

*''ইবনে মাসুদ বলেছেন: নবী (সঃ) এর সময়ে আমরা পাঠ করতাম, ''*হে আমাদের রসূল (মুহাম্মদ) আপনি বলেদিন যা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আপনার উপর অবতীর্ন হয়েছে যে, আলী ঈমানদারদের প্রভু, যদি আপনি তা না প্রচার করেন তাহলে আপনি তার বার্তাকে সঠিকভাবে পৌঁছে দেননি।''* (সূত্র: কোরআন সুরা ৫ আয়াত ৬৭)

[সূত্র : জালাল আল-দিন আল-সুয়ুতি, দূর্‌র আল-মানসুর, খন্ড২, পৃঃ২৯৮]

ঠিক এক্ষেত্রেও উপরোক্ত বাঁকা অক্ষরে লেখা অংশটি অবশ্যই কোরআনের অংশ নয়, তবে সাহাবী ইবনে মাসুদ উক্ত আয়াতের নাযিল হওয়ার কারন ব্যাখ্যা করতে এই অংশটুকু জুড়ে পড়তেন।

সপ্তম অধ্যায় :

''......এবং আল্লাহ্‌ কে ভয় কর, তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন....''

(আল-কোরআন, সুরা বাক্কারাহ, আয়াত : ২৮২)

আল্লাহর রসূল (সঃ) বলেন :''জ্ঞান অন্বেষণ প্রত্যেক মুসলান নর-নারীর ওপর ফরজ।''

[সূত্র : আল-মাজলিশি বিহার আল-আনওয়ার, খন্ড- ১, পৃঃ- ১৭৭]

আত্মার গুণাবলী **

জ্ঞান অন্বেষণ : ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী জ্ঞান অন্বেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যা কোন ব্যক্তিকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করে।

জ্ঞান অন্বেষণের লক্ষ্যটি স্বয়ং জ্ঞানের চেয়েও অতি গুরুত্বপূর্ণ। ঐশী লক্ষ্য নিয়ে সত্য জ্ঞান অন্বেষণ, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য এবং তাঁর সৃষ্টির সেবার উদ্দেশ্য হলে, ঐ ব্যক্তিকে নবী ও আওলিয়াদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। কিন্তু ব্যক্তিগত ও পার্থিব অর্জন বা দুনিয়াদারীর উদ্দেশ্য জ্ঞান অর্জন করা হলে তা ঐ ব্যক্তিকে মূর্খতা, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির বিরুদ্ধে পাপ এবং সর্বোপরি জাহান্নমের দিকে পরিচালিত করে।

জ্ঞানের বাস্তবতা :

* মহানবী মুহাম্মদ (সঃ) বলেন: ''জ্ঞান ব্যাপক চর্চার মাধ্যমে (অর্জিত) হয় না। বরং এটি একটি আলো যা আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির হৃদয়ে প্রেথিত করেন তাকে তিনি হেদায়েত করতে চান।'' *[সূত্র : আল-মাজলিসি, বিহারুল-আনওয়ার, খন্ড-৬৭, পৃষ্ঠা- ১৪০]*

* জ্ঞানের সকল শাখাকে এর প্রকৃতি নির্বিশেষে মূলতঃ দু'টি প্রধান শ্রেনিতে ভাগ করা যায়; ১. আখিরাত বিষয়ক জ্ঞান-যার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র উচ্চতম নৈকট্য অর্জন করা, আল্লাহর সৃষ্টির সেবা করা, এবং আখিরাতের পুরস্কার লাভ করা। ২.পার্থিব জ্ঞান যার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে বস্তুগত লক্ষ্য, সামাজিক মর্যাদা, এবং ব্যক্তিগত অহমিকা ও স্বার্থপরতার পরিতৃপ্তি বিধান করা। এভাবে জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যই নির্দিষ্ট করে দেয় তা পার্থিব না আখিরাত মুখী।

*যে আত্মা সব সময় নিজেকে খারাপ প্রবণতা ও আত্মা প্রীতি থেকে পবিত্র করতে সচেষ্ট থাকে সে ঐশী চেতনা লাভ করে। এরপর যে জ্ঞান সে লাভ করে তা হয় সত্য ঐশী জ্ঞান, কেননা তা তাকে বিভিন্ন ভালো কাজ সম্পাদনের দিকে তাড়িত করে এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্যের দিকে পরিচালিত করে। এই বাস্তব জ্ঞানই হচ্ছে তার আধ্যাত্মিক আলোকবর্তিকা যা আল্লাহ্‌র দিকে সরল পথ দেখায় এবং পরম আনন্দময় জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়।

* যে আত্মপ্রীতি ও খারাপ প্রবণতা দিয়ে প্রভাবিত থাকে তাকে শয়তানী চরিত্র হাতছানি দেয় এবং সে যুক্ত মূর্খতার (মূর্খতা ও নিজ মূর্খতা সম্পর্কে অজ্ঞাত) দিকে চালিত হয়। মনে সৃষ্টির ঐশী উদ্দেশ্যও বাস্তবতা, স্রষ্টাগুনাবলী এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে অন্ধত্ব ও অসচ্ছতার পর্দা পড়ে যায়। এভাবে, যে জ্ঞানই সে অর্জন করে তা সে দুনিয়াবী লক্ষ্য, স্বার্থপর উদ্দেশ্য এবং খারাপ কর্মকান্ডের দিকে পরিচালিত করে যা শেষ পর্যন্ত তাকে জাহান্নামে নিয়ে যায়।

* মহানবী মুহাম্মদ (সঃ) বলেন, ''নিশ্চয়ই জ্ঞান তিনটি জিনিসের সমন্বয় : সুদৃঢ় নিদর্শন, ন্যায়ানুগ দায়িত্ব এবং প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ (পদ্ধতি)। আর সবই প্রয়োজনের অতিরিক্ত ।''
[সূত্র : আল কুলাইনী, আল-ক্বাফী, খন্ড- ১, ''কিতাব ফাদ্বাল্‌ঝ আল-ইলম্‌'', ''বাব সিফাত আল-ইলম্‌ ওয়া ফাদ্‌লুহ'', হাদীস নং- ১]

*'সুদৃঢ় নিদর্শন' বলতে বোঝায় যৌতিক বিজ্ঞানসমূহ, সত্য তত্ত্বসমূহ ও ঐশী শিক্ষাকে।' ন্যায়ানুগ দায়িত্ব' বলতে বুঝায় নৈতিক ও আত্মশুদ্ধিও বিজ্ঞানসমূহকে। 'প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ' বলতে সেইসব বিজ্ঞানকে বোঝায় যা বস্তুগত বিষয় ও কিছু শারীরিক কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করে। কখনও কখনও, জ্ঞান অর্জন হয়ে দাঁড়ায় 'ন্যায়ানুগ দায়িত্ব' এবং কখনও 'প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ্‌'।

*বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞান, যেমন চিকিৎসাবিদ্যা, ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষবিদ্যা ইত্যাদিকে যখন ঐশী নিদর্শন ও প্রতীক হিসাবে দেখা হয়, এবং ইতিহাস ও সভ্যতা সংক্রান্ত বিজ্ঞানসমূহকে যখন শিক্ষা গ্রহন ও সতর্কবাণী আহরণের মাধ্যম হিসাবে নেয়া হয় তখন সেগুলিও 'সুদৃঢ় নিদর্শন'- এর শ্রেনীতে অর্ন্তভুক্ত হতে পারে, কেননা এর মাধ্যমে খোদায়ী জ্ঞান বা পুনরুত্থানদিবসের জ্ঞান অর্জিত হয় বা নিশ্চিত করা হয়।

সত্য জ্ঞান অর্জনের কল্যাণ :

*মহানবী মুহাম্মদ (সঃ) বলেন, ''যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে বের হয়, আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করেন। এবং নিশ্চয়ই ফেরাস্তারা তখন আনন্দে জ্ঞান অন্বেষণকারীর ওপর তাদের পাখা বিস্তার করে রাখে। নিশ্চয়ই জান্নাত ও পৃথিবীর সকল সৃষ্টি এমন কি সমুদ্রের মাছও জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য ক্ষমার প্রার্থনা করতে থাকে। একজন আলেমের (জ্ঞানীর) মর্যাদা একজন আবেদের (ইবাদতকারী) থেকে এত বেশী যেমন পূর্ণিমার রাতে চাঁদের ঔজ্জ্বল্য তারাদের থেকেও বেশী। জ্ঞানীরা নবীদের উত্তরাধিকারী, কেননা নবীরা যে উত্তরাধিকার সম্পদ রেখে গেছেন তা জ্ঞান ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি এ থেকে অংশ নেয় সে প্রচুর কল্যাণ লাভ করে।''
[সূত্র : আল-কুলাইনি, আল-কাফী, খন্ড- ১,; ''কিতাব ফাদ্বআল আল-ইল্‌ম,'' হাদীস নং- ১]

সত্য জ্ঞানের নৈতিক গুণাবলী :

* জ্ঞান যখন বিশুদ্ধ, নিস্বার্থ এবং খোদায়ী উদ্দেশ্যে অর্জিত হয় তখন তা ঐ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে জান্নাতী সত্ত্বায় রূপান্তরিত করে। এ ধরণের জ্ঞানী ব্যক্তি ঐশী চেতনালব্ধ বৈশিষ্ট্যের প্রতিরূপ হয়ে যান এবং তার চরিত্র, কথা ও কাজে তা সুস্পষ্ট হয়।

* ইমাম আলী (আঃ) প্রায়ই বলতেন : ''হে জ্ঞান অন্বেষণকারী, জ্ঞানের অসংখ্য কল্যাণকর দিক রয়েছে। (একে যদি কোন মানুষের সাথে কল্পনা কর তাহলে) -এর মাথা হল বিনয়, এর চোখ হলো হিংসা হতে মুক্তি, এর কান হল বুঝতে পারা, এর জিহ্বা হল সত্যবাদিতা, এর স্মরণশক্তি হলো গবেষণা, এর হৃদয় হলো উত্তম উদ্দেশ্য, এর বুদ্ধিমত্তা হলো বিষয়বস্তু ও পদার্থের ওপর বিশেষ জ্ঞান (মারিফাহ), এর হাত হল সহানুভূতি, এর পা হলো জ্ঞানীর সাথে সাক্ষাৎ করা, এর সিদ্ধান্ত হলো সততা, এর প্রজ্ঞা হল ধর্মনিষ্ঠা, এর বাসস্থান হলো পরিত্রান, এর কান্ডারী হলো কল্যাণ, এর চূড়া হলো বিশ্বস্ততা, এর অস্ত্র হলো ভাষার নম্রতা, এর তরবারী হলো পরিতৃপ্তি(রিদা), এর ধনুক হল সহ্যশক্তি, এর সেনাবাহিনী হলো জ্ঞানীদের সাথে আলোচনা, এর সম্পদ হলো পরিশুদ্ধ আচরণ, এর সঞ্চয় হলো পাপ হতে বিরত থাকা, এর পাথেয় হলো নৈতিক উৎকর্ষ, এর পানি পান হলো নম্রতা, এর সাথে নির্দেশকারী হলো ঐশী নির্দেশনা এবং এর সহযাত্রী হলো নির্বাচিতদের প্রতি ভালোবাসা।''

[সূত্র : আল-কুলাইনী, আল-কাফী, খন্ড-১, ''কিতাব ফাদাল্ আল-ইলম'', বাব আল্-নাওয়াদির, হাদীস নং-৩]

* আল্লাহ্র রসূল (সঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল : ''জ্ঞান কি? তিনি বললেন, ''নিরব থাকা'' আবার জিজ্ঞাসা করা হলো : ''এরপর ?'' তিনি বললেন, ''মনোযোগের সাথে শোনা।'' তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো : ''এরপর?'' তিনি বললেন, ''স্মরন রাখা।'' তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো : ''এরপর?'' তিনি বললেন, ''(জ্ঞান অনুযায়ী) আমল করা।'' তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করা হলো : ''এরপর ?'' তিনি বললেন, ''প্রচার করা।''

[সূত্র : আল-মাজলিসি, বিহারুল আনওয়ার, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৮]

* ইমাম আলী (আঃ) প্রায়ই বলতেন, ''জ্ঞানী ব্যক্তির লক্ষণ তিনটি ; জ্ঞান, ধৈর্য্য এবং স্বল্পভাষিতা।''

[সূত্র : ইবিদ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৯]

যখন জ্ঞান অর্জন নিষেধ ..

রসূল (সঃ)- এর আহলে বাইতের শিক্ষা অনুযায়ী স্বার্থপর লক্ষ্য ও দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন নিষেধ।

ইমাম আলী (আঃ) বলেন, ''চারটি উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন করো না -
১. মানুষের সামনে আত্ম গৌরব প্রকাশের জন্য, ২. মূর্খ লোকদের সাথে তর্কের জন্য, ৩. জনসমাবেশে নিজেকে জাহির করার জন্য, ৪. কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে কোন পদ লাভ করতে জনগনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য।''

[সূত্র : আল-মজলিসি, বিহারুল আনওয়ার, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩১]

জ্ঞানঅর্জনের অত্যাবশ্যকীয় শর্তাবলী :

জ্ঞান অন্বেষনকারীর প্রথম কাজ হলো আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনে সচেষ্ট হওয়া, তার আত্মা ক্রমশ: খোদাভীতিকে প্রবিষ্ঠ করানো, খারাপ প্রবণতা ও দুনিয়াবী উদ্দেশ্য থেকে নিজেকে মুক্ত করা, এবং নিয়মিত আত্ম-মূল্যায়ণ করা যে, জ্ঞানার্জন দুনীয়াবি উদ্দেশ্য হচ্ছে কিনা। এটি অবশ্যই মনে রাখা উচিৎ যে, একজন আলেমের প্রধান বৈশিষ্ঠ্য হলো খোদাভীতি এবং যার খোদাভীতি নেই সে জ্ঞানীদের পর্যায়ভুক্ত নয়, তার যত বেশীই স্মরণ শক্তি থাকুক বা জন সমাবেশে সে যতই হৃদয়গ্রাহী বক্তা হোক না কেন।

জ্ঞান অন্বেষনের প্রতিটি পদক্ষেপেই আপনাকে ধ্যান করতে হবে এবং এ ব্যাপারেও গভীর চিন্তা করতে হবে যে, আপনার জ্ঞান অর্জনের প্রধান উদ্দেশ্য কী। নিজেকে প্রশ্ন করুন: কেন আমি জ্ঞান অর্জন করছি ? এটি কি চাকুরিতে কোনো ভালো অবস্থান লাভের জন্য, কোনো সহকর্মী বা কোনো দলের সাথে প্রতিযোগিতার জন্য, কোনো পুরস্কার, কোনো ডিগ্রি বা কোনো সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য ? আপনি কি উচ্চ শিক্ষা অর্জন করছেন কোনো বই বা নিবন্ধ লেখার জন্য, কিংবা কোনো খোলামেলা সমাবেশে বক্তৃতার জন্য যাতে লোকেরা আপনাকে একজন বিদ্বান বা পন্ডিত বলে প্রশংসা করে ? নাকি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং তার সৃষ্টি সেবার মানসে ?

যে জ্ঞান আপনি অর্জন করেন তা আপনাকে অধিক ধার্মিক হতে সাহায্য করা উচিৎ, একই পথে নিষ্ঠাপূর্ণ কাজ সম্পাদন এবং যত বেশী অগ্রসর হবেন তত বেশী আল্লাহ্কে ভালোবাসতে ও ভয় করতে উৎসাহিত করা উচিৎ। যে জ্ঞান মানুষকে ভালো কাজের দিকে চালিত করেনা তা সত্য জ্ঞান নয়। আর যে জ্ঞান কেবল শব্দাবলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং আল্লাহ্র সৃষ্টির সেবা করার ক্ষেত্রে কোনো বাস্তব প্রয়োগ নেই তা নিম্নস্তরের জ্ঞান; এটি সময়ের সাথে বিলীন হয়ে যায়।

জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি আপনার আচরণ প্রত্যক্ষ করুন। এটি কি আপনাকে অধিক বিনয়ী এবং আপনার বন্ধু ও সহকর্মীদের প্রতি অধিক ধৈর্যশীল করে ? নাকি তা আপনাকে আরও উদ্ধত, অহংকারী এবং তর্কপ্রিয় করে ? এতে কি আপনার সত্য স্বীকার করতে বা সমাবেশে অজ্ঞতা স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ হয় ? এতে কি যারা আপনার থেকে অধিক জ্ঞানী তাদের প্রতি হিংসার উদ্রেক হয় ? মনে রাখবেন, সত্য জ্ঞান অহমিকাকে ভেঙ্গে দিয়ে তা নিশ্চিহ্ন করে এবং সত্য জ্ঞনের আচরণগত চিহ্ন হলো যে, এটি সম্পূর্নভাবে আহমিকা, গৌরব, আত্মপ্রিয় এবং ঔদ্ধত্য শূন্য।

জ্ঞান অন্বেষণকালে আল্লাহ্‌র উপর আস্থা রাখুন, আপনার শিক্ষককে সম্মান করুন এবং বয়:কনিষ্ঠদের নিকট হতেও জ্ঞান অর্জন করতে ইতস্ততঃ বোধ করবেননা। যা শিখেছেন তা পুনরায় পাঠ করুন এবং চিন্তা করুন। সবসময় আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন যেন তিনি ঐশী করুণা বর্ষণ করেন এবং উত্তম চিন্তা দিয়ে অনুপ্রাণিত করেন, এবং জ্ঞানকে দুনিয়াবী ও স্বার্থপর প্রবণতার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা থেকে রক্ষা করেন।

পরিশেষ ঃ

ইমাম আলী (আ:) বলেন: ''যে ব্যক্তি জ্ঞাণ অন্বেষনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীর সমতুল্য।''

[সূত্র : আল-মাজলিসি, বিহারুল আনওয়ার, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৯]

অষ্টম অধ্যায় :

হযরত মুহাম্মদ(সঃ) প্রসঙ্গ :

''মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তির পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহ্‌র রসূল ও শেষ নবী' (সূত্র : কুরআন ৩৩ : ৪০)

অমুসলিমরা মুহাম্মদ সম্পর্কে কি বলেন : ....

ইসলামের নবী (তাঁর ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর শান্তি ও করুনা বর্ষিত হোক)

বহুসংখ্যক অমুসলিম মনিষীদের মন্তব্য থেকে কতিপয় সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি এখানে সংগ্রহ করা হল, যদের মধ্যে আছে শিক্ষাবিদ, লেখক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহুসংখ্যক রাজনৈতিক কর্মী। আমাদের জামানতে তাদের কেউই মুসলিম হননি। কাজেই, এসমস্ত উক্তি নবী (স:) এর জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গকে প্রতিফলিত করে।

মাইকেল এইচ. হার্ট :

(১৯৩২) জ্যোর্তিবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের ইতিহাসের প্রফেসর বলেন, ''মুহাম্মদকে বিশ্বের বহু প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের তালিকা হতে শ্রেষ্ঠ নেতা হিসাবে আমার পছন্দ করার কারণে বহু পাঠক বিস্মিত হতে পারেন এবং অনেক প্রশ্ন উঠতে পারেন, কিন্তু ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ উভয় দিক থেকেই শতভাগ সফল ছিলেন।''

[সূত্র : The 100: A Ranking Of The Most Influential Person In Histroy, Newyork,1978, পৃষ্ঠা-৩৩]

আলফোসে ডি লামার্টিন :

(১৭৯০-১৮৬৯) ফ্রান্সের কবি ও রাজনীতিবিদ বলেন, ''দার্শনিক, ধর্মপ্রচারক, আইনজীবি, যোদ্ধা, মতবাদের বিজয়কারী, একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্মমতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কারী যার কোনো অস্তিত্ব ছিলনা; বিশটি ভূখন্ড বিশিষ্ট সাম্রাজ্য এবং আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, তিনিই হলেন মুহাম্মদ। মানব চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের যত মানদন্ড আছে সবটাকে বিবেচনা করে, এই প্রশ্ন আমরা সহজেই করতে পারি, তাঁর চেয়ে মহৎ, তাঁর চেয়ে মহান কোনো ব্যক্তিত্ব কি আছে ?''

[সূত্র : Translated from 'Histoire de La Turquie, Paris, 1854, খন্ড-২, পৃ-২৭৬-২৭৭]

রেভারেন্ড বসওয়ার্থ স্মিথ :

(১৭৯৪-১৮৮৪) ট্রিনিটি কলেজের বিলম্বিত ফেলো, অক্সফোর্ড বলেন,''.....তিনি ছিলেন একাই সিজার (রাজা) ও পোপ(ধর্মগুরু); তবে তিনি পোপ ছিলেন পোপের দুরহ অহংকার ছাড়া এবং সিজার ছিলেন সিজারের সৈনবাহিনী ছাড়া। নিয়মিত সেনাবাহিনী ছাড়া, দেহরক্ষী ছাড়া, রাজপ্রাসাদ ছাড়া, নির্ধারিত রাজস্ব ছাড়া, যদি কেউ কখনও বলার অধিকার রাখে যে, কেউ অলৌকিক ক্ষমতা বলে রাষ্ট্র শাসন করেছেন তাহলে তিনি হলেন মুহাম্মদ; কারণ তাঁর কাছে সমস্ত শক্তিই ছিল কোনো উপকরন ছাড়া।''

[সূত্র : Mohammed and Mohammedanism, London, 1874, পৃ-২৩৫]

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী :

(১৮৬৯-১৯৪৮) ভারতের চিন্তাবিদ, রাষ্ট্র নায়ক এবং জাতীয়তাবাদী নেতা বলেন,''আমি আরও অনেক দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করলাম যে, শুধু তলোয়ার নয় যা তৎকালীন সমাজ জীবনে পরিকল্পনায় ইসলামের জন্য একটি স্থান দখল করেছিল। তা ছিল দৃঢ় সরলতা, নবীর চরম আত্মত্যাগ, অঙ্গীকারের প্রতি তার নিখুত শ্রদ্ধা ও সতর্কতা, তাঁর স্বজন ও অনুসরণকারীদের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালোবাসা, তাঁর অটল সাহস, তাঁর নির্ভীকতা, প্রতিপালকের প্রতি ও তাঁর নিজস্ব উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁর অবিচল আস্থা। তলোয়ার নয়, বরং এসমস্ত গুণাবলীই যাবতীয় সবকিছুকে তাঁদের কাছে নিয়ে আসে এবং সকল অসুবিধা থেকে মুক্ত করে।''

[সূত্র : Young India(periodical), 1928, খন্ড- ১০]

এডওয়ার্ড গিবন :

(১৭৩৭-১৭৯৪) তাঁর সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রিটিশ ঐতিহাসিক হিসাবে খ্যাত, তিনি বলেন, ''মুহাম্মদ এর জীবনের সবচাইতে বড়ো সাফল্য প্রভাবিত হয়েছিল একমাত্র তাঁর দৃঢ় নৈতিক শক্তির দ্বারা কোনো তরবারির আঘাত ছাড়াই।''

[সূত্র : Hisatrou Of The Saracen Empire, London,1870]

অ্যানি বেস্যান্ত :

(১৮৪৭-১৯৩৩)ব্রিটিশ দিব্যজ্ঞানী এবং ইন্ডিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতা, ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে, তিনি বলেন, ''যে ব্যাক্তি আরবের মহান নবীর জীবনী ও চরিত্রের অধ্যায়ন করেছে, যে জানে যে কীভাবে তিনি শিক্ষা প্রদান করেছেন এবং কীভাবে তিনি জীবন নির্বাহ করেতেন, সে এই মহৎ নবীর প্রতি শ্রদ্ধাবনত না হয়ে পারবেনা। তিনি সর্বশক্তিমানের শ্রেষ্ঠ বার্তাবাহকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এবং যদিও আমি এ বিষয়ে লিখতে গিয়ে আমি অনেক কিছুই বলব যা অনেকেরই জানা, তবুও আমি অনুভব করি যে এগুলো আমি যতবারই পড়ি, ততই সেই মহৎ আরব-দেশীয় গুরুর প্রতি আমি নতুন ভাবে ভক্তি ও শ্রদ্ধা অনুভব করি।''

[সূত্র : The Life and Teaching of Muhammad, Madraz, 1932, পৃ- ৪]

এডওয়ার্ড গিবন :

(১৭৩৭-১৭৯৪) তার সময়কালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রিটিশ ঐতিহাসিক হিসাবে খ্যাত বলেন, ''তাঁর (অর্থাৎ মুহাম্মদের) অত্যন্ত তীব্র স্মৃতিশক্তি ছিল, তাঁর বুদ্ধি ছিল প্রখর এবং তিনি ছিলেন অত্যন্ত সামাজিক। তাঁর অনুমান ছিল মহিমান্বিত, তাঁর ফয়সালা ছিল স্পষ্ট, দ্রুত ও চূড়ান্ত। তিনি সংকল্প ও কাজে উভয় ক্ষেত্রে সৎ সাহসের অধিকারী ছিলেন।''

[সূত্র : Histroy of th Decline and Fall of the Roman Empire, London, 1838, Mä-5, f³-335]

উইলিয়াম মন্টগোমারী ওয়াট :

(১৯০৯) ইডেনবার্গ ইউনিভার্সিটির আরবী ও ইসলাম বিভাগের প্রফেসর বলেন,''তাঁর বিশ্বাসের কারণে যে, কোন অত্যাচার সহ্য করার জন্য তার তৎপরতা, যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল তাদের উচ্চ নৈতিক চরিত্র এবং তাঁকে নেতা হিসেবে মেনে নেওয়া এবং তাঁর চূড়ান্ত কৃতিত্বের বিশালতা- এইসব তাঁর মৌলিক সততা, ন্যায়পরতা ও চরিত্রের ঋজুতা প্রকাশ করে। যদি মুহাম্মদকে ভন্ড বলে আখ্যায়িত করা হয় তাহলে এমন সব নতুন সমস্যার সৃষ্টি হবে যা সমাধান যোগ্য নয়। উপরন্তু, মুহাম্মদের ন্যায় ইতিহাসের আর কোনো মহান ব্যক্তিত্ব পশ্চিমা ইতিহাসে এত হীন ভাবে আলোচিত হয়নি।''

[সূত্র : Mohammad at Mecca, Oxford, 1953, পৃ-৫২]

নবম অধ্যায় :

জ্ঞানচর্চা :

নবী (স:) বলেন **''আমি জ্ঞনের গৃহ আর আলী তার দরজা''**

[সূত্র : সহী আল তিরমিজি, (মিশর সংস্করণ), কিতাব আল মানাকিব, খন্ড-৫, পৃ-৬৩৭, হাদীস সংখ্যা- ৩৭২৩]

যে ধর্মাপদেশের কোনো যতি চিহ্ন নেই :

সকল ধরনের মুসলিম চিন্তাবিদদের মতে হযরত আলী বিন আবু তালিব(আঃ) জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বাগ্মিতার জন্য সুপ্রসিদ্ধ। তাঁর একটি উপস্থিত ধর্মোপদেশ পূর্ণ আরবী বক্তৃতার লিখিত রূপে কোন যতিচিহ্নের প্রয়োজন ছাড়াই তা সুস্পষ্ট অর্থ প্রদান করে এতে তাঁর আরবী ভাষার উপর দখল ও জ্ঞানের গভীরতার প্রমাণ বহন করে।

এই ধর্মোপদশের বিশেষ বিশেষত্ব কী ?

যারা আরবী জানে, অথবা নূন্যতম কোরআন পড়তে পারে, তারা অবশ্যই নুকতা বিশিষ্ট অক্ষর গুলির গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। এ অক্ষর গুলোর তালিকা নীচে দেওয়া হল এবং অক্ষরগুলো আরবী বক্তৃতা, বিবৃত, লিখায় সবসময় ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

উপরিক্ত বর্ণগুলি ছাড়া অর্থপূর্ণ শব্দগঠন অত্যন্ত কঠিন কাজ। হযরত আলী (আ:) যেমন তাঁর সকল ধর্মোপদেশ উপরোক্ত নুকতা বিহীন হরফ ছাড়া করেছেন তেমনি পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া এমন একটি ধর্মোপদেশ তৈরি করা অত্যন্ত বিস্ময়কর বটে!

[টীকা: তাই 'অক্ষর' আগের দিনে আরবী ভাষায় নুকতা ছাড়াই ব্যবহৃত হত]

এমন কি আর কোনো ধর্মোপদেশ আছে ?

ইমাম আলী (আঃ) আর এমন একটি ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন যাতে আলিফ অক্ষরটি ছিলনা। আলিফ অক্ষরটি প্রায় প্রতিশব্দেই দেখা যায়। যদি নুকতা বিহীন হরফ ছাড়া কয়েকটি লাইন লিখা কঠিন হয়, তাহলে আপনারা যে প্রমাণটি দেখেছেন তা অপেক্ষা আরও কয়েকগুণ বড়ো বক্তৃতা আলিফ অক্ষর ছাড়া কত কঠিন। কত জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার পরিচায়ক।

এই ধর্মোপদেশটিকে বলা হয় আল-খুতবা আল-মুনিকা এবং তা বহু মুসলিম পন্ডিতগণ সংগ্রহ করেছেন। সুন্নী পন্ডিতদের মধ্যে যাঁরা তা করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

[সূত্র : মুহাম্মদ বিন মুসলিম আল-শাফীই, কিফায়াত আল-তালীব, পৃ-২৪৮, ইবনে আবিল হাদিদ আল-মুতাজিলি, শরহে আহজ আল-বালাগাহ, খন্ড-১৯, পৃ-১৪০]

হজরত আলী (আ:) এমন কতৃত্বপূর্ণ কার্যের অধিকারী হলেন কীভাবে ?

ইমাম আলী(আ:) মুহাম্মদ (স:) এর নিকট আত্মীয় এবং তাঁর সহিত গভীর সম্পর্কের কারণে অগাধ পান্ডিত্য এবং অসাধারণ বাকপটুতার অধিকারী হন। মহানবী (স:) ঐশী অনুপ্রেরনায় প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের উৎস ছিলেন আর তিনিই ছিলেন আলী (আ:) এর শিক্ষক।

হযরত আলী(আঃ)-এর বিখ্যাত ভাষণগুলির মধ্যে একটি ভাষণ :

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি প্রশংসিত এবং সম্রাটের সম্রাট, হে প্রানপ্রিয় অধিকর্তা! সকল সৃষ্টি জীবনের স্রষ্টা, নির্যাতিতদের সহায়, ভূপৃষ্ঠের বিশালতা দানকারী, পাহাড় পর্বতকে সুদৃঢ়ভাবে স্থাপনকারী, বৃষ্টি বর্ষণকারী, কষ্ট উপশমকারী, যিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব কিছু জানেন, সম্পদ ও সাম্রাজ্য যার হুকুমে ধ্বংস হয়ে যাবে। যিনি নব যুগের সূচনা করেন পুরাতনকে ভেঙ্গে নতুন গড়েন এবং পুনারুবৃত্তি করেন, যিনি সব বস্তুর সৃষ্টি ও ধ্বংসকারী, সকল বস্তুর পরিনতি যার হাতে নিবদ্ধ। যার দয়া ও মহানুভবতা জগৎ জুড়ে, যিনি মেঘের স্তর সৃষ্টি করেন এবং তা থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটান, কেউ যদি আল্লাহকে একবার স্মরণ করে ডাকেন তবে তিনি সাথে সাথে বহুগুন বহুবার উত্তর দেন।

তাঁর প্রতি অশেষ প্রশংসা। যারা তাঁর নিকট ফিরে গেছে তাঁরা তাঁকে যেমন বিশাল পরাক্রমশালী দেখে আমিও তাঁকে সেভাবেই স্মরণ করি। দেখো, তিনি আল্লাহ তিনি ভিন্ন মানুষের জন্য অন্য কোনো মা'বুদ নেই। তিনি যা কিছু সোজা সুপ্রতিষ্টিত রাখতে চান তা কেউ নষ্ট করতে পারেনা। তিনি মুহাম্মদ (স:)কে ইসলামের আদর্শ প্রচারক হিসেবে প্রেরণ করেছেন, তিনি শাসকদের আদর্শ এবং তাদের অত্যাচার উৎপীড়ন, নির্যাতন দমনকারী। উদ এবং সাবা মূর্তির মালিকদের তিনি বিকলাঙ্গ করেছেন, তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, শিখিয়েছেন, (উপযুক্তস্থানে) নিযুক্ত করেছেন এবং পরিপূর্ণ করেছেন। তিনি কিয়ামতের সম্পর্কে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং আগাম সতর্ক দিয়েছেন। আল্লাহ তাকে সম্মানের সাথে যুক্ত করেছেন এবং মনে শান্তি দিয়েছেন এবং আল্লাহ তাঁর বংশধরদের প্রতি দয়া এবং তাঁর পবিত্র ও সম্মানিত পরিবারবর্গে প্রতি করুণা বর্ষণ করেছেন। যতদিন আকাশে সুনিয়ন্ত্রিত তারকাবাজি আলো দিবে, যত দিন আকাশে নতুন চাঁদ উঠবে, যতদিন একত্ববাদের (লা ইলাহা ইলাল্লাহু) সুর চারিদিকে ধ্বনিত হবে। আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করুন। সর্বোত্তম কাজ করার তৌফিক দিন, সুতরাং ন্যায়বানদের পথে চলুন। আল্লাহদ্রোহীদের পথ থেকে দুরে সরে থাকুন। আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলুন এবং এ ব্যাপারে সতর্ক হন, আত্মীয়তার বন্ধনকে বজায় রাখুন এবং উহাকে আরও সুদৃঢ় করুন।

ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে কোনো কাজ করবেননা এবং অসৎ ইচ্ছাকে দূরে সরিয়ে দিন, ধার্মিক ও ন্যায় পরায়ণদের সাথে আত্মীয়ের মত বন্ধন সুদৃঢ় করুন এবং লোভ আমোদ-প্রমোদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করুন।

আপনাদের পরিচালক জন্মগতভাবে স্বাধীন, মানুষদের মধ্যে অত্যন্ত পরিপূর্ন, সর্বাধিক উদার এবং সম্মানিত এবং পারিবারিক ঐতিহ্য সুন্দর ও গৌরবময়। তিনি তোমাদের নিকট এসেছেন এবং তোমাদের আত্মীয়কে অনুমতিক্রমে বিয়ে করে কনে হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এমন কিছু যৌতুক দেওয়া হয়েছে, যে পরিমাণ আল্লাহর রসূল উম্মে সালামাকে দিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই, তিনিই ছিলেন সবচেয়ে দয়াবান জামাতা, তাঁর বংশধরদের প্রতি দয়ালু, তিনি যার সাথে চেয়েছেন তাদেরকে বিয়ে দিয়েছেন। তিনি তার পছন্দের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ছিলেননা বা তিনি ভুলেও যাননি।

তাঁর পক্ষ থেকে চিরস্থায়ী অনুগ্রহ লাভের আশায় আপনাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে আবেদন করি এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য যেন তিনি সকলকে উৎসাহিত করেন, তাদের নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য এবং পরকালীন জীবনের জন্য এবং প্রত্যেকের শেষ গন্তব্যের জন্য যেন উপযুক্ত প্রস্তুতি নিতে পারেন। মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য কৃতজ্ঞতা এবং তাঁর মহানবী (স:) এর জন্য প্রশংসা।

এই ধর্মীয় আবেদন আলী (আ:)কারও বিবাহ উপলক্ষে পাঠ করেছেন সম্ভবত তাঁর নিজের বিয়েতে তিনি এই খুতবা পাঠ করে থাকবেন। বহু পন্ডিত কর্তৃক এই খুতবা উদ্ধৃত হয়েছে যথা .

الخطبة العارية عن النقطة للإمام علي (عليه السلام)

الحمد لله الملك المحمود والمالك الودود مصور كل مولود مآل كل مطرود ساطح

المهاد وموطد الأوطاد ومرسل الأمطار ومسهل الأوطار عالم الأسرار ومدركها

ومدمر الأملاك ومهلكها ومكور الدهور ومكررها ومورد الأمور ومصدرها عم

سماحه وكمل ركامه وهمل وطاوع السؤال والأمل أوسع الرمل وأرمل أحمده

حمدا ممدودا وأوحده كما وحد الأواه و هو الله لا إله للأمم سواه ولا صادع

لما عد له وسواه أرسل محمدا علما للاسلام وإماما للحكام ومسددا للرعاء

ومعطل أحكام ود وسواع أعلم وعلم وحكم وأحكم أصل الأصول ومهد وأكد

الموعود وأوعد أوصل الله له الأكرام وأودع روحه السلام ورحم آله وأهله الكرام

ما لمع رائل وملع دال وطلع هلال وسمع اهلال.

اعملوا رعاكم الله اصلح الأعمال واسلكوا مسالك الحلال واطرحوا الحرام ودعوه واسمعوا أمر الله وعوه وصلوا الأرحام وراعوها وعاصوا الأهواء واردعوها وصاهروا أهل الصلاح والورع وصارموا رهط اللهو والطمع ومصاهركم أطهر الأحرار مولدا وأسراهم سؤددا وأحلاهم موردا وها هو أمكم وحل حرمكم مملكا عروسكم المكرمه وماهر لها كما مهر رسول الله أم سلمه وهو أكرم صهر أودع الأولاد وملك ما أراد وماسها مملكه ولا وهم ولا وكس ملاحمه ولا وصم اسأل الله لكم احماد وصاله ودوام اسعاده وألهم كلا اصلاح حاله والاعداد لمآله ومعاده وله الحمد السرمد والمدح لرسوله أحمد (ص).

[সূত্র : মুহাম্মদ রিদা আল-হাকিমী, সালুনি কাবল এন তাফাকিদুনি, খন্ড-২, পৃ-৪৪২-৪৪৩, সাইদ আল- মুসাভী, আল জাতারাহ্ মিন বিহার মানাকিব আলনবী ওয়াআল ইতরাহ্, খন্ড-২, পৃ-১৭৯, হাসুন আল দুলাফী, ফাদা ইল আল আল রসুল, পৃ-৬]

দশম অধ্যায় :

''আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা'' *(সূত্র : আল কুরআন ৩ :১০৩)*

শিয়া কাদের বলা হয় ?

''শিয়া'' পরিভাষাটি মূলতঃ একটি বিশেষণ হিসেবে রাসূল (স:)-এর বংশধরদের (আহ্‌লে বাইত) মাঝ থেকে মনোনিত ইমামদের যারা অনুসরণ করেন তাদেরকে বুঝানো হয়। তারা এটি কোনো গোষ্ঠিবাদ বা মুসলমানদের মধ্যে বিভাজনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেননা, বরং তারা শব্দটি এজন্য ব্যবহার করেন যে, তা পবিত্র কোরআনে ব্যবহৃত করা হয়েছে, মহানবী (স:) ব্যবহার করেছেন এবং প্রথম যুগের মুসলমানগণ এটি ব্যবহার করতেন- যখন সুন্নী বা সালাফী এ জাতীয় শব্দ অস্তিত্বলাভ করেনি।

কিন্তু রসূল (স:) কি এরূপ বিভাজনমূলক পরিভাষা ব্যবহার করতে পারেন ? নবী ইব্রাহীম (আ:) কি গোষ্ঠিবাদী ছিলেন ? অথবা নবী নূহ (আ:) এবং নবী মূসা (আ:) কি গোষ্ঠীবাদী ছিলেন ? যদি শিয়া কোনো বিভেদ সৃষ্টিকারি বা গোষ্ঠিবাদী পরিভাষা হত, তাহলে আল্লাহ্ না তাঁর উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন নবীদের ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করতেন, না মহানবী (স:) তাঁদের প্রশংসা করতেন।

এটি অবশ্যই সত্য যে, রাসূল (স:) কখনই মুসলমানদের দলে দলে বিভক্ত করতে চাননি। তিনি সকল মানবজাতিকে ইমাম আলী (আ:)-এর অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে এবং পরবর্তীকালে তার উত্তরসূরী ও খলিফা হিসাবে। দুর্ভাগ্যক্রমে যারা রসূল (স:)-এর ইচ্ছার কদর করেছিল তাদের সংখ্যা ছিল অল্প এবং তারাই ''আলীর শিয়া'' হিসেবে পরিচিত ছিল। তারা সবধরনের বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিল, সেই দিন থেকে, যেদিন মানবতার মুক্তিদাতা মুহাম্মদ (স:) ইন্তেকাল করলেন, সে দিন থেকে যদি সমগ্র মুসলিম জাতি রসূল (স:)-এর ইচ্ছার পালন করতো, তাহলে ইসলামে শ্রেনীভেদের কোনো অস্তিত্ব থাকতো না। হাদীস অনুসারে, রসূল (স:) বলেন: ''আমার পর কিছুদিনের মধ্যেই তোমাদের মাঝে বিরোধ ও বিদ্বেষ এর উদ্ভব হবে, যখন সেরকম পরিস্থিতি হবে তখন আলী-কে খুঁজে বের করবে, কেননা সে একমাত্র সত্যকে মিথ্যা হতে পৃথক করতে সক্ষম''

[সূত্র : আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী, কানজ আল-উম্মাল (মুলতান), খন্ড-২, পৃ-৬১২, সংখ্যা-৩২৯৬৪]

ইতিপূর্বে উল্লিখিত কোরআনের আয়াত সম্পর্কে কিছু সংখ্যক সুন্নী আলেম, রসূল (স:)-এর বংশধরগণের ষষ্ঠ ইমাম, ইমাম জাফর আল-সাদ্বিক (আ:) হতে বর্ণিত: ''আমারই আল্লাহ্‌র রজ্জু যে সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন: আর তোমরা সকলে একত্রে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ় ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা''

[সূত্র : আল-সালাবী, তাফসীর আল-কাবীর, ৩:১০৩ আয়াতের ব্যাখা প্রসঙ্গে ইবনে হাজার আল-হায়সামী, আল-সাওয়াইক আল-মুহ্‌রিকাহ্, (কায়রো) অধ্যায়-১১, অংশ-১, পৃ-২৩৩]

সুতরাং, যদি আল্লাহ্ শ্রেণীভেদকে অপছন্দ করেছে, তবে তা তাদের জন্য আল্লাহ্‌র রজ্জু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তাদেরকে নয় যারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছে!

পরিশেষ ঃ

আমরা এটি স্পষ্ট করেছি যে, শিয়া শব্দটি পবিত্র কুরআনে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বান্দাদের অনুসারীদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং রাসূল (স:) এর হাদীস অনুযায়ী ইমাম আলী (আ:)-এর অনুসারীদের জন্য। যে ব্যক্তি এরূপ ঐশ্বরিক পথপ্রদর্শকের অনুসারী সে ধর্মীয় দ্বন্দ্ব থেকে নিরাপদ থাকবে এবং আল্লাহ্‌র মজবুত রজ্জুকে করায়ত্ত করার ফলে সে জান্নাতের সুসংবাদ পাবে।

আল-কুরআনে শিয়া :

''শিয়া'' শব্দের অর্থ অনুসারী, কোনো দল বা গোষ্ঠীর সদস্য নয়। আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর কিছু দ্বীনদার বান্দাগণ শিয়া ছিলেন। আর তারা নিশ্চয়ই ইব্রাহীমও তাঁর শিয়াদের অন্তর্ভূক্ত ছিল।'' *(সূত্র : আল-কুরআন ৩৭:৮৩)*

এবং তিনি (মূসা-আ:) শহরে প্রবেশ করলেন এমন সময়ে যখন তার অধিবাসীরা ছিল বেখবর, সেখানে তিনি দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখলেন, এদের একজন ছিল তাঁর নিজ শিয়া এবং অপরজন শত্রুদলের। অতঃপর যে তাঁর শিয়া সে শত্রুদলের ঐ লোকটির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে সাহায্য আবেদন করল। (সূত্র : আল কুরআন ২৮:১৫)

এভাবে 'শিয়া' আল্লাহর মনোনীত একটি শব্দ যা তিনি কুরআনে তাঁর উচ্চ ও সম্মানিত নবী ও তাঁদের অনুসারীদের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন। যদি কেউ কোনো সত্যপন্থী বান্দার শিয়া হয়, তাহলে তার শিয়া হওয়ার কোনো দোষ থাকতে পারেনা। অন্যদিকে, যদি কেউ কোনো অত্যাচারী অথবা পাপীর শিয়া হয়, তাহলে সে তার নেতার মতোই ভাগ্য বরণ করবে। পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে শেষ বিচারের দিন মানুষ দলে দলে আসতে থাকবে এবং প্রত্যেক দলের অগ্রভাগে সেই দলের নেতা বা ইমাম থাকবে।

একাদশতম অধ্যায় :

আল্লাহ্ বলেন :

''(স্মরণ কর) যেদিন আমি প্রত্যেককে তাদের ইমামসহ আহ্বান করব।''

(সূত্র : আল-কুরআন ১৭:৭১)

শেষ বিচারের দিনে, প্রত্যেক দলের অনুসারীদের ভাগ্য নির্ভর করবে তাদের ইমামদের ভাগ্যের উপর (যদি তারা সেই ইমামদেরকে যথার্থই অনুসরণ করেছে)। আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন ইমাম দুই ধরনের রয়েছে: যথা-

''আমরা তাদেরকে ইমাম বানিয়েছি কিন্তু তারা জাহান্নমের দিকে আহ্বান করত, কেয়ামতের দিন তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবেনা। এ পৃথিবীতে অভিশাপকে তাদের পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি এবং কেয়ামতের দিনে হবে দূর্দশাগ্রস্ত।''

(সূত্র : আল-কুরআন ২৮:৪১-৪২)

পবিত্র কুরআন এও মনে করিয়ে দেয় যে আল্লাহ এমন ইমামদেরকেও মনোনীত করেছেন যাঁরা মানবজাতির জন্য পথপ্রদর্শক:

''তারা সবর করত বলে আমরা তাদেরকে ইমাম মনোনীত করেছিলাম যাতে তারা আমাদের আদেশে পথ প্রদর্শন করে এবং তারা আমাদের আয়াত সমূহে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল''

(সূত্র : আল-কুরআন ৩২:৩৪)

''নিশ্চয়ই, এইসব ইমামদের সত্য পন্থী অনুসারীগণ (শিয়া) কিয়ামতের দিন প্রকৃত সমৃদ্ধি লাভ করবে।''

''হে মুমীনগণ! তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে যাও আন্তরিক তওবার সাথে, হয়তো তোমাদের রব তোমাদের মন্দ কাজ গুলি মোচন করে দেবেন।''

(সূত্র : আল-কুরআন, সুরা আত্-তাহ্রীম, আয়াত্ ঃ ৮)

আল্লাহ্র রসূল (স:) বলেন ঃ ''তাওবাকারীর চারটি চিহ্ন রয়েছে ঃ

১) সে কর্মকান্ডে আল্লাহ্র প্রতি আন্তরিক,

২) সে মিথ্যা এড়িয়ে চলে,

৩) সে দৃঢ়ভাবে সত্যের সাথে যুক্ত থাকে এবং

৪) সে ভালো কাজ করতে উৎসুক থাকে''

[সূত্র : আল-হারানি, তুহাফ আল-উকূল, পৃষ্ঠা-২০]

আত্মার গুণাবলী :

অনুতাপ *(তাওবাহ্)*

ইমাম জাফর আস-সাদিক (আ:) বলেন ঃ ''যখন কোনো বান্দা আন্তরিক অনুতাপসহ (তাওবাতুন নাসুহ) আল্লাহ্র দিকে ফিরে যায়, তখন আল্লাহ্ তাকে ভালোবাসেন এবং দুনিয়া এবং আখিরাতে তাকে (তার পাপসমূহ থেকে) ঢেকে রাখেন।'' আমি বললাম,''কীভাবে তিনি তাকে ঢেকে রাখবেন ?'' ইমাম (আ:) জবাবে বলেন, ''তিনি দুই ফেরেশতাকে (লেখক ফেরেশতাদ্বয়) তার যে পাপ লেখা হয়েছিল, তা ভুলে যাবার নির্দেশ দেন। এরপর তিনি তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অনুপ্রানিত করে (বলেন), 'তার পাপগুলো গোপন কর' এবং তিনি জমিনের সেই স্থানকে অণুপ্রানিত করে বলেন, 'তোমার ওপর সে যে পাপ করতো তা গোপন করো'। এরপর সে আল্লাহ্র সাথে এমনভাবে সাক্ষাৎ করে যে, তার কোনো পাপ সম্পর্কে সাক্ষী দেওয়ার কেউ থাকেনা।''

[সূত্র : আল-কুলাইন, আল-কাফী, কিতাব আল-ইমান ওয়া আল-কুফর, বাব আল-তাওবাহ্, হাদীস- ১]

তাওবাহ্র বাস্তবতা :

তাওবাহ্ বলতে বোঝায় মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) উন্মেষের পর আত্মার যে প্রাথমিক আধ্যাত্মিক পর্যায় সেখানে ফিরে যাওয়া। কেননা পূর্বে তার চেতনা পাপ ও অবাধ্যতার কারণে অন্ধকারের আবরণে ঢাকা পড়ে ছিল। মানবাত্মার প্রাথমিক পর্যায়ে এর কোনো আধ্যাত্মিক গুণ বা দোষ কিছুই থাকেনা। এটি যে কোনো স্তরে পৌঁছাতে সক্ষম এবং তা মূল অবস্থায় থাকে বিশুদ্ধ, পাপমুক্ত এবং একটি স্বভাবজাত ঔজ্জ্বল্যে পরিপূর্ণ। পাপের প্রস্তুতি হৃদয়কে অস্বচ্ছ করে এবং স্বভাবগত প্রকৃতির আলো (নূর) নিভে গিয়ে তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। যাহোক, হৃদয় অন্ধকার দিয়ে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে যাবার পূর্বেই যদি কেউ অবহেলার তন্দ্রা থেকে জেগে ওঠে তাওবাহ্ করে, তাহলে আত্মা ধীরে ধীরে অন্ধকার থেকে আলোময় মূল এবং আবশ্যকীয় আধ্যাত্মিকতার দিকে ফিরে আসে। ইমাম বাক্বির (আ:) এর বিখ্যাত হাদীসে এটি উল্লেখিত হয়েছে ঃ ''যে পাপ হতে অনুতাপ (তাওবাহ্) করে, সে সেই ব্যক্তির মত যে পাপই করেনি ....।''

[সূত্র : আল-কুলাইনো, আল-কফী, কিতাব আল-ইমান ওয়াল কুফ্র, বাব আত-তাওবাহ্, হাদীস- ১০]

তাওবাহ্র অত্যাবশ্যকীয় এবং প্রয়োজনীয় শর্তাবলী :

সে ব্যক্তির তাওবাহ্ কবুল করা হয়না যে ঘোষণা করে, ''আসতাগফেরুল্লা বা আমি অনুতপ্ত''। তাওবাহ্ গৃহীত হবার অনেকগুলো শর্ত রয়েছে যা অবশ্যই পূরণ করতে হবে। নীচের হাদীসে সেগুলোর উল্লেখ রয়েছে ঃ

হবে। নীচের হাদীসে সেগুলোর উল্লেখ রয়েছে ঃ বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি ইমাম আলী (আ:) এর সামনে 'আসতাগফেরুল্লাহ'(আমি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি) উচ্চারণ করলো। তিনি তাকে বললেন, ''তোমার মা তোমার জন্য শোক করুন। তুমি কি জানো 'ইসতিগফার' অর্থ কি ? নিশ্চয় 'ইসতিগফা' হলো ইল্লিয়ান এর (মানুষের উচ্চ মর্যাদার) একটি স্তর এবং এটি এমন একটি শব্দ যা ছয়টি বিষয়কে বোঝায়। প্রথম হলো অতীতের জন্য অনুশোচনা করা। দ্বিতীয়, কখনও তা না করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। তৃতীয়, সেই বান্দার কাছে যাওয়া যার অধিকার পূর্বে হরণ করা হয়েছিল, যাতে তুমি আল্লাহ্‌র সাথে এমন পবিত্র অবস্থায় সাক্ষাৎ করতে পারো যে, তোমার বিরুদ্ধে কারও কোনো দাবি নেই। চতুর্থ, সকল দায়িত্ব পালন করা যা তুমি তোমার উদ্দেশ্য পূরণ করতে গিয়ে অবহেলা করেছিলে। পঞ্চম, তোমার দেহের রক্ত-মাংসের দিকে মনোযোগ দাও যা অন্যায় পরিচর্যায় বেড়ে উঠেছে, যাতে তোমার দুঃখ ও অনুশোচনার ফলে তা গলে যায় এবং তোমার চামড়া হাড়ের সাথে লেগে যায়, এরপরও সে স্থানে নতুন রক্ত মাংস গড়ে ওঠে। ষষ্ঠ, তোমার দেহকে আনুগত্যের পীড়ার স্বাদ গ্রহণ করাও যা পূর্বে পাপের আনন্দময় স্বাদ গ্রহণ করেছিল। যখন তুমি এ কাজগুলো সম্পাদন করবে তখন বলবে 'আসতাগফেরুল্লাহ'!'' *[সূত্র : নাহাজুল বালাগাহ্‌, বাণী-৪১৭]*

এ পবিত্র হাদীসটি তাওবার দু'টি পূর্বশর্ত উল্লেখ করা হয়েছে (অনুতাপ এবং সিদ্ধান্ত), কবুল হবার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত উল্লেখিত হয়েছে (স্রষ্টা এবং সৃষ্টির অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া) এবং সর্বশেষে, অনুতাপের বিশুদ্ধির জন্য দু'টি দিক তুলে ধরা হয়েছে।

তাওবাতুন্ নাসুহ (আন্তরিক অনুতাপ) ঃ

বিখ্যাত গবেষক আল-শায়খ আল-বাহাই (র:)এর মতে তাওবাতুন্ নাসহ্ এর অনেকগুলো অর্থ রয়েছে। এদের কয়েকটি এখানে উল্লেখিত হলো:

যে তাওবাহ্ মানুষকে 'উপদেশ' দেয়, অর্থাৎ এটি অনুতাপের ভাল ফলাফল হিসেবে ব্যক্তিকে অনুপ্রানিত করে, অথবা যে তাওবাহ্ অনুতাপকারীকে পাপ নির্মূল এবং কখনও পুনরাবৃত্তি না করার পরামর্শ দেয়।

যে তাওবাহ্ বিশুদ্ধভাবে কেবল আল্লাহ্‌র জন্যেই করা হয়, যেমন করে খাঁটি মধু মোমমুক্ত থাকে, আর একেই বলা হয় আসালুন নাসুহ্। ঐকান্তিকতার দাবী হলো এই যে, অনুতাপ হতে হবে পাপের জঘন্যতা ও আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির জন্য- দোজখের আগুনের ভয়ে নয়।

'নাসুহ' শব্দটি আরবী 'নাসাবাহ্' শব্দের সাথেও সম্পর্কযুক্ত, যার অর্থ হলো সেলাই করা, কেননা তাওবাহ্ পাপের কারণে ঈমানের ছিড়ে যাওয়া দেহকে সেলাই করে

এবং এটি অনুতপ্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র আওলিয়া (বন্ধু) ও তাঁর প্রতি ভালোবাসা পোষণকারীদের সাথে সেভাবে যুক্ত করে টুকরো টুকরো কাপড়কে সেলাই করে জোড়া লাগানো হয়। এ ছাড়াও অপর একটি ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'নাসুহ্' হলো অনুতাপীর বৈশিষ্ট এবং তাওবাতুন নাসুহ্ হলো এমন তাওবাহ্ যে এর সম্পাদনকারী নিজেকে এমন একটি পরিপূর্ণ অনুতাপের জন্য সতর্ক করে যে, পাপের প্রভাব থেকে হৃদয় সম্পূর্ণ শোধিত না হওয়া পর্যন্ত সে ক্ষান্ত হয় না। এ পর্যায়টি তখনই অর্জিত হয় যখন আত্মা দুঃখ-বেদনার স্বাদ নেয় এবং উত্তম আমলের নূরের মাধ্যমে অতীত পাপের ফলে সৃষ্ট অন্ধকারকে দূর করে।

যত শীঘ্র তত মঙ্গল :

সফল 'তাওবাহ্' একটি কঠিন কাজ। নানা ধরনের গুনাহতে নিমজ্জিত হওয়ায়, বিশেষ করে গুরুতর ও ভয়ানক গুনাহ্, ব্যক্তিকে তাওবাহ্ সম্পর্কে সম্পূর্ন অচেতন রাখে। যদি হৃদয়ের বাগানে রোপিত পাপের বৃক্ষ পূর্ণ বিকশিত হয়ে তার শেকড় শক্তিশালী হয়, এর ফলও হয় বিপর্যয়কর, এতে ব্যক্তি অনুতাপ থেকে দূরে সরে যায়। এমনকি কখনও কখনও তাওবাহ্‌র কথা মনে আসলেও সে তা আজ না কাল, কিংবা এ-মাসে না ও-মাসে এভাবে স্থগিত রাখে এবং নিজেকে বলে ''আমি শেষ বয়সে সঠিক ভাবে তাওবাহ্ করে নেব''। এভাবে তা ঐকান্তিক চিন্তা হিসেবেই রয়ে যায়। তাওবাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সময়কাল হচ্ছে যৌবনকাল, যখন পাপের পরিমাণ কম থাকে। হৃদয়ের অভ্যন্তরে আঁধার অসম্পূর্ণ থাকে এবং তখন তাওবাহ্‌র শর্তগুলো পূরণকরা সহজ হয়। আল্লাহ্ প্রদত্ত এ সুযোগ যে কোনো মূল্যে গ্রহণ করা উচিৎ এবং তাওবাহ্-কে স্থগিত রাখার শয়তানি ইশারায় সাড়া দেওয়া উচিৎ নয়। সুতরাং পাপ সংঘটিত হওয়ার পর যত সম্ভব শীঘ্র তাওবাহ্ করা উচিৎ। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি যে এটি অনুভব করে, সে পাপ থেকে বিরত থাকে এবং অতীতের পাপ মোচন করে। তার অনুশোচনায় পূর্ণ অনুতপ্ত হৃদয়ে, পাপের জীবন থেকে বেরিয়ে আসার দৃঢ় প্রত্যয় জেগে ওঠে। আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন, আর যদি তাওবাহ্ আন্তরিক হয় তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভালোবাসা লাভ করে- যেমন কুরআনে বলা হয়েছে: ''আল্লাহ্ তাওবাকারীকে ভালোবাসেন।''

(সূত্র : সূরা বাক্বারা ঃ ২২২)

ইমাম আলী (আ:) বলেন ঃ ''যদি তোমরা পরলোকে তাঁর করুণা লাভ করতে চাও, তবে আজই প্রস্তুতির সময়, কেননা আগামীকাল পুরস্কার দিবস। যাত্রার স্থান হচ্ছে জান্নাতের দিকে, যখন ধ্বংসের স্থান হচ্ছে জাহান্নাম। তোমাদের মাঝে কি এমন কেউ নেই যে মৃত্যুর পূর্বেই তার কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করবে, ত্রুটিপূর্ণ কাজের জন্য ক্ষতিপূরণ (কাফ্‌ফারা) দেবে এবং তার ওপর বিপর্যয়কর শাস্তি নেমে আসার পূর্বেই সে

কাজ করবে ?''

[সূত্র : নাহাজুল বালাগাহ, খুৎবা-৩৩]

তাওবাহ্‌র জন্য হৃদয় জাগ্রত করার ডাক :

* হে মানুষ! তুমি কতটা পাপী এবং বোকা যে তুমি তোমার স্রষ্টার বিপুল দানকে অস্বীকার করো। বছরের পর বছর আনুগত্যে অতিক্রম করেছো এবং সুদীর্ঘকাল এমন করুণাময় এক প্রভুর অবিশ্বস্ততা করেছো যিনি তোমার সব ধরনের আরাম-আয়েশের উপকরণ যুগিয়েছেন অনস্তিত্ব থেকে, নাউজুবিল্লাহ, (কল্পনার সব কল্যাণ তাঁর প্রতি) তাঁর পবিত্রতা লঙ্ঘন করেছো এবং নির্লজ্জতা ও অবাধ্যাতর শিখরে পৌছে এখন তুমি বেদনা হত ও অনুতপ্ত। আর আজ মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তোমায় তাঁর প্রিয়দের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। কী বিপুল-বিশাল তাঁর কৃপা এবং পরিপূর্ণ তাঁর দান। হে আল্লাহ! আমরা আপনার বদান্যতার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে অসমর্থ। আমাদের জিহ্বা আপনার যথার্থ প্রশংসা জ্ঞাপনে অক্ষম। আমরা কেবল লজ্জায় আমাদের মাথা গুলো আপনার সামনে নত করতে পারি এবং আমাদের নির্লজ্জতার জন্য আপনার কাছে ক্ষমা আবেদন করতে পারি। আমরা আপনার ক্ষমার উপযুক্ত নয়। সত্যই, আপনার কৃপা অজস্র এবং দান এতই যে তার বর্ণনা করা অসম্ভব।

* বিচক্ষণ ব্যক্তির উচিৎ পাপ থেকে সৃষ্ট অনুতাপ ও দুঃখবোধকে হৃদয়ে ঘনীভূত করা যাতে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, অনুশোচনার অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ পাপের অনিবার্য ও ভয়ংকর পরিণতির কথা চিন্তা করে, হৃদয়ের অনুতাপ গভীরতর হয় ফলে তার হৃদয়ে পবিত্র অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়, যে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয় **''এটি আল্লাহ্‌র প্রজ্বলিত অগ্নি - যা হৃদয় পর্যন্ত পৌছবে। এতে তাদেরকে বেঁধে দেয়া হবে।''** *(সূত্র : সুরা হামজাহ : ৬-৮)*

অনুতপ্ত হৃদয়ের ঐ অগ্নিশিখা তার সব পাপকে ভস্মীভূত করবে এবং সব মরিচা ও ক্ষয়কে পুড়িয়ে পরিশুদ্ধ করবে। আর অবশ্যই জেনে রাখা উচিৎ যে, যদি দুনিয়া ত্যাগ করে আখিরাতের জীবনে প্রবেশ করবে এবং তার জন্য প্রস্তুত ভয়ঙ্কর তীব্র আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। তখন তার জন্য দোজখের দরজাগুলোকে খুলে দেয়া হবে এবং বেহেশতের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হবে। এভাবেই বিচক্ষন ব্যক্তি পাপের অনিবার্য কঠিন পরিণতির বিষয়টি অনুধাবন করে থাকে।

* হে আল্লাহ ! আমাদের অন্তরগুলোকে অনুতাপের আগুনে প্রজ্বলিত করুন। আমাদের অন্তরগুলোকে দুনিয়ার আগুনে প্রজ্বলিত করুন এবং তাতে অনুতাপের স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করে তা বাড়িয়ে দিন। আমাদের অন্তরের মরিচা সমূহকে দূর করুন এবং এমন অবস্থায়

এ দুনিয়া থেকে নিয়ে যান যখন আমরা পাপের প্রভাব থেকে মুক্ত। নিশ্চয়ই আপনি অবারিত রহমতের মালিক।

[সূত্র : আল খোমাইনী, চল্লিশ হাদিস, অধ্যায়-১৭, 'তাওবাহ্' হতে সংকলিত]

পরিশেষে :

ইমাম জয়নুল আবেদীন (আঃ) বলেন, ''হে আল্লাহ্ ! আপনি হলেন সেই সত্তা যিনি ক্ষমার দুয়ারকে খুলে দিয়েছেন এবং এর নাম দিয়েছেন 'তাওবাহ্' কেননা আপনি বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহ্র কাছে তওবা কর- আন্তরিক তওবা'

(সূত্র : সুরা আত-তাহ্রীম-৮)

তারজন্য আর কী অজুহাত থাকতে পারে যে দরজা উন্মুক্ত থাকার পরেও তাতে প্রবেশের ব্যাপারে উদাসিন থাকে ?'

[সূত্র : আল-সহিফা আল-কামিলাহ্, তোবাকারীর গোপন নামাজ]

ইসলাম সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ তথ্য বিস্তারিত জানতে হলে নীচের ওয়েবসাইটটি দেখুন :
HTTP://al-islam.org/faq/

ইসলাম সম্বন্ধে বিস্তারিত নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ তথ্য
অবগত হতে হলে :-
http://al-islam.org/faq/